মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক

মার্কসবাদ এবং তার দর্শনগত বনিয়াদ অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কতগুলি সূত্রের সমষ্টি বা সূত্রবাদ নয়। এ হ'ল বিজ্ঞানের সকল শাখায় আহরিত ও ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতার সংযোজন ও সাধারণীকরণের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত একটি বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন যা সমস্ত সামাজিক সমস্যা নিরসনে পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। আর অবিরাম নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তা আরও বিকশিত হতে থাকে। এই ভাষণটি একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে প্রদত্ত। বিজ্ঞানের সমসাময়িক অগ্রগতিকে সামনে রেখে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল নীতিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এই ভাষণের মধ্য দিয়ে সহজ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

আজ থেকে আগামী ক'দিন ধরে যে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির এখানে পরিচালিত হবে তার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মার্কসবাদ। প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, আমাদের হাতে যতটা সময় আছে তাতে এত অল্প সময়ে মার্কসবাদী দর্শনের সমস্ত দিক বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তা হলেও মার্কসবাদ সম্বন্ধে জরুরি ও মূল্যবান বিষয়গুলো যতটা সম্ভব আমি এই ক্লাসে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

মার্কসবাদ চর্চা করব কেন

প্রথমেই একটা কথা সাধারণভাবে সকলের বোঝা দরকার, তা হচ্ছে — দুনিয়াতে এতসব দর্শন থাকা সত্ত্বেও আমরা বিশেষ করে মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি কেন, বা মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করার ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করছি কেন? সেটা কি নিছক এইজন্য যে, মার্কসবাদ কেবলমাত্র একটা বিশেষ দর্শন এবং একটা বিশেষ দর্শন হিসেবেই আমরা তাকে জানতে চাইছি — নাকি, এর অন্য কোন অর্থ, অন্য কোন তাৎপর্য আছে? আপনাদের মনে রাখা দরকার, আমাদের কাছে মার্কসবাদ আলোচনাটা স্কুল-কলেজের ছাত্ররা যেমনভাবে বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন মতবাদ পড়ে, বা আলোচনা করে, ঠিক তেমন নয়। আমরা মার্কসবাদকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ বলে মনে করি যা আজকের দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের পক্ষে — যে মানুষ সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে ত্বরান্বিত করতে চায় তার পক্ষে — চর্চা করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমি জানি, এ নিয়ে প্রচুর মতপার্থক্য আছে। এটা থাকতেই পারে এবং এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু, আমি যা সত্য বলে মনে করি সেই সমস্ত বিষয়ই আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমার অনুরোধ, আমার কথাগুলো আপনারা বিচার করেই গ্রহণ করবেন, অন্ধতার বশবর্তী হয়ে নয়। অর্থাৎ, আমি বলছি বলেই আমার কথাগুলো সত্য — বিষয়টিকে এমনভাবে আপনারা ধরে নেবেন না। এই ধরনের চিন্তার মধ্যে একটা যান্ত্রিকতার ঝোঁক কাজ করতে বাধ্য। আর যান্ত্রিকতার এই ঝোঁক শুধু সত্যানুসন্ধানকে গুলিয়ে দেয় তাই নয়, অনেক ক্ষতি করতে পারে। তাই, আমি বলছি বলেই নয়, সবকিছুকে বিচার করে যাচাই করেই বক্তব্য বিষয়ের সত্যাসত্য আপনাদের গ্রহণ করতে হবে।

শুধু গোটা পৃথিবীর শোষিত মানুষই নয়, এক কথায় বলতে গেলে মানব সভ্যতাই আজ চূড়ান্ত সংকটের সম্মুখীন। এই সংকটের মূল কারণ কী এবং কেন এইসব সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেগুলি খুঁজে বের করার কাজটি বিশেষ করে শোষিত মানুষের কাছে অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি মনে করি, মার্কসবাদী দর্শন আয়ত্ত করতে না পারলে এবং এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি না জন্মালে আজকের দিনের শোষিত মানুষ বর্তমান দুনিয়ার নানাবিধ সমস্যা ও সংকটের চরিত্র সম্পর্কে যথার্থ ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে না এবং নানাবিধ অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও বিভিন্ন সমস্যার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না। জীবনের প্রতিটি বিষয়েই — রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই — "কেন" এটা হচ্ছে, "কেন" ওটা হচ্ছে — একের পর এক প্রশ্নের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। এইসব "কেন"-র উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারে মার্কসবাদ ছাড়া এমন দ্বিতীয় কোন বিজ্ঞান নেই। তাছাড়া মার্কসবাদের কাজ শুধু দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করাই নয়, দুনিয়াকে পাল্টানোও তার কাজ। তাই ক্রিয়াহীন নিষ্ফলা মতবাদের সাথে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞান

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি আমার বক্তব্যে মার্কসবাদকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করেছি, যদিও দুনিয়ার সুধীসমাজের কাছে মার্কসবাদ সাধারণভাবে একটি দর্শন হিসেবে, একটি 'স্কুল অভ থট্', একটি বিশেষ চিন্তাধারা বা মতবাদ হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু, আমি মার্কসবাদকে যেমন করে বুঝেছি তাতে আমার মতে মার্কসবাদ আর পাঁচটা দর্শনের মত শুধুমাত্র একটি বিশেষ মতবাদ বা 'স্কুল অভ থট্' — এভাবে বুঝলে ভুল হবে। কেননা সেক্ষেত্রে এটাই মনে হবে যে, মার্কসবাদ যেন অন্যান্য দর্শনেরই সমগোত্রীয়। এইভাবে বোঝার অর্থ দাঁড়াবে, সাধারণ মানুষ নিজেদের ভালোলাগা-মন্দলাগার ওপর ইচ্ছা করলে মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে পারেন, বা বর্জনও করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টা ঠিক তেমন নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটতে পারে না। বিষয়টা উদাহরণ দিয়ে বললে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। ধরুন, কেউ যদি বলেন, ফিজিক্সের নানা 'স্কুল অভ থট্' আছে — তার মধ্যে যেকোন একটিকে কেউ বেছে নিতে পারেন, তাহলে নিশ্চয়ই কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিজ্ঞানের জগতে এহেন চিন্তার কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেটা ঘটতে পারে, তা হচ্ছে, কোন একটি বিষয় সম্পর্কে একাধিক বৈজ্ঞানিক একাধিক 'হাইপথেসিস' খাড়া করতে পারেন। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই সেইসব হাইপথেসিস-এর কোন্‌টা সত্য, বা যদি এর কোনটাই সত্য না হয়, বিচার করেই তা নির্ধারণ করতে হয়। এই কারণে বিজ্ঞান দুনিয়ার সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য। দেশ ও জাতির পার্থক্যের সাথে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি পাল্টায় না। তাই, আমি যখন বলছি, মার্কসবাদ হচ্ছে একটি বিজ্ঞান, এবং সেই বক্তব্য যদি সঠিক হয় — এটা কী ধরনের বিজ্ঞান সেই আলোচনায় আমি পরে আসব — তাহলে একটা কথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, বিজ্ঞান হিসেবে এটা সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর কোন জাতি বা দেশ থাকতে পারে না। সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষ ও সমস্ত জাতির সামনে যত প্রশ্ন, যত জিজ্ঞাসা আছে একমাত্র মার্কসবাদই তার সঠিক উত্তর দিতে পারে। তারপরে একটাই প্রশ্ন আমাদের কাছে থাকতে পারে, তা হচ্ছে, আমরা বিজ্ঞানকে গ্রহণ করব না বর্জন করব?

আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, আমরা সত্য জানতে চাই, সত্যানুসন্ধান করতে চাই এবং এটাও আমরা জানি যে, বিজ্ঞানই হচ্ছে একমাত্র হাতিয়ার যা মানুষকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে। বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের কাছে সত্য সঠিকভাবে জানার কোন উপায় নেই। কোন মনগড়া চিন্তার দ্বারা আমরা সত্যকে জানতে পারি না, জানা সম্ভব নয়। তাই যে মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ একটি সামগ্রিক বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠেছে সেই মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে জানা, উপলব্ধি করা ও বাস্তবে প্রয়োগ করার কাজটি শুধু গুরুত্বপূর্ণ তাই নয় — অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের চর্চাকে কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা ভালোলাগা-মন্দলাগার ওপর ছেড়ে দেওয়া চলে না।

এখন, এই বিজ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝি? সাধারণত বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি। এগুলোকে আমরা বিজ্ঞান বলি কেন? কারণ এগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে সত্যের সন্ধান করে। বিজ্ঞানের এই বিভাগগুলো কোন্ ধরনের সত্যের সন্ধান করে? এগুলো বিশেষ বিশেষ বস্তু যে বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলোর দ্বারা পরিচালিত হয়, বিভিন্ন শাখায় আলাদা করে সেই নিয়মগুলোকে অনুসন্ধান করে, স্টাডি (বিচার) করে। যেমন, বস্তুর রাসায়নিক গুণ ও ক্রিয়াকলাপ এবং রাসায়নিক নিয়মকানুনকে পর্যালোচনা করে 'কেমিস্ট্রি' বা রসায়নবিজ্ঞান। আবার, যে সমস্ত ভৌত নিয়ম বা 'ফিজিক্যাল ল'-র দ্বারা বস্তু পরিচালিত হয় তাকে স্টাডি এবং প্রয়োগ করে পদার্থবিজ্ঞান। একইভাবে জীবজগতের নানা ধরনের পরিবর্তন ও কার্যকলাপকে যে বিজ্ঞান অনুধাবন করার চেষ্টা করে সেটা হ'ল জীববিজ্ঞান। আবার, সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে উপলব্ধি করা ও প্রভাবিত করার জন্য যে বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করে সেটা হ'ল সমাজবিজ্ঞান।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে, বিজ্ঞানের এই শাখা-প্রশাখাগুলো বস্তুর বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ, গুণাবলী ও নিয়মকে জানবার ও প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছে। এখানে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার। তা হচ্ছে, বিজ্ঞানের এই বিশেষ বিভাগগুলো আপাতদৃষ্টিতে বা 'ফর্মালি' আলাদা হলেও বাস্তবে এরা আলাদা নয়। এরা সকলেই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, একসূত্রে গাঁথা — অনেকটা মেয়েদের গলার হার বা 'নেকলেস'-এর মত। তাই একসময়ে একটি প্রশ্ন দেখা দিল যে, দুনিয়াতে এমন কোন বিজ্ঞান আছে কি, যে বিজ্ঞান গোটা

বস্তুজগতের সমস্ত বিশেষ নিয়ম, সমস্ত বিশেষ সত্যগুলোকে বিচার করতে ও সংযোজন (integrate) করতে সক্ষম? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে চাই, মানব ইতিহাসে এমন কোন বিজ্ঞান দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আগে গড়ে ওঠেনি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ বেয়ে মানবসভ্যতার একটি বিশেষ স্তরে এসে একমাত্র দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই এ ধরনের সামগ্রিক বিজ্ঞান (কম্প্রিহেন্সিভ সায়েন্স) হিসেবে গড়ে উঠেছে — যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে আহরিত সত্য বা জ্ঞানকে 'কো-অর্ডিনেট' (সংযোজিত) করে দুনিয়া সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ও সুসমঞ্জস ধারণা, কতগুলো সাধারণ সত্যকে তুলে ধরেছে। এই কারণেই আবার দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে 'কো-অর্ডিনেশন অভ সায়েন্স' বা 'সায়েন্স অভ অল সায়েন্সেস', অর্থাৎ, 'বিজ্ঞানের সংযোজন' বা 'সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' বলা হয়। আর, এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই হচ্ছে মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি বা বুনিয়াদ। এ এমন একটা দর্শন যার দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনীন (ইউনিভার্সাল) — গোটা দুনিয়াটাই যার বিচরণক্ষেত্র।

বিষয়টাকে আর একটু পরিষ্কার করে দেখা যাক। গোটা বস্তুজগতকে 'ফর্মাল লজিক' অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাগ করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে পদ্ধতি চালু আছে তাকে প্রয়োগ করে বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ক্রিয়াকলাপ, বিশেষ নিয়ম, বা ভিন্ন ভিন্ন গুণগুলোকে আমরা আলাদা করে জানছি। কিন্তু, মনে রাখা দরকার, বস্তুর এই ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম বা গুণগুলোকে জানলেই তা থেকে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ বস্তুধারণা (ম্যাটার কন্সেপ্ট) পেতে পারি না — যেমন পেতে পারি না মানবসমাজ, তার নীতি-নৈতিকতা, প্রগতি-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার সঠিক সমাধান। তাই বলছিলাম, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ থেকে আহরিত যে বিশেষ সত্যগুলো আমরা জানতে পারছি সেই বিশেষ সত্যগুলোকে সংযোজিত করার কাজটি করবে কোন্ বৈজ্ঞানিক বা কোন্ ধরণের বিজ্ঞান? একাজ আইনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিকরা করতে পারেন না, করা সম্ভবও নয়। অথচ এমন একটা সামগ্রিক বিজ্ঞান আমাদের প্রয়োজন যে বিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা থেকে আহরিত সত্য বা জ্ঞানকে সংযোজিত করতে পারে, জীবনে তার তাৎপর্য কী, কার্যকারিতা কী, সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে পারে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হ'ল সেই ধরনের একটা সামগ্রিক বিজ্ঞান (কম্প্রিহেনসিভ সায়েন্স)। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আগে অন্য কোন দর্শন এই কাজটা পুরোপুরি বা সম্পূর্ণভাবে করতে পারেনি। এ চেষ্টা অন্য কোন দর্শন করেনি তা নয়। দর্শনকে বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে 'কো-অর্ডিনেশন অভ সায়েন্স' হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ গড়ে ওঠার আগেও অনেক হয়েছে। দীর্ঘ সেই ইতিহাস। সেই চেষ্টা কখনও দু'পা এগিয়েছে, আবার কখনও দু'পা পিছিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের একটা সামগ্রিক বিজ্ঞান গড়ে ওঠার মতো বাস্তব পরিবেশ বা পরিস্থিতি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত তৈরি হয়নি এবং এই কারণেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আগে সামগ্রিক বিজ্ঞানের চরিত্র নিয়ে আর কেউ গড়ে উঠতে পারেনি।

সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, অন্যান্য দর্শনের সাথে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তফাৎ হচ্ছে, অন্য কোন দর্শন পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। বিভিন্ন দার্শনিকের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি, আত্মোপলব্ধি ও মনীষার ওপর মূলত নির্ভর করেই অন্যান্য দর্শনগুলো গড়ে উঠেছে এবং সেগুলো বিজ্ঞানের ওপর খবরদারি করতে চেয়েছে। সামগ্রিক বিজ্ঞান বা কম্প্রিহেনসিভ সায়েন্স-এর জায়গায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ছাড়া অন্য কোন দর্শন পৌঁছাতে পারেনি — যে বিজ্ঞান মানুষকে পুরোপুরি সত্যের সন্ধান দিতে পারে, সত্যানুসন্ধান করতে পারে, জীবনকে সমস্ত দিক থেকে সঠিকভাবে 'গাইড' করতে পারে। এ কাজ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কেন? কারণ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন যে সময়ে গড়ে উঠেছে সেই সময়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলোর এমন অগ্রগতি ঘটেছে যার ফলে একাজ করা তখন তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, যে ঘটনা ঘটা এই ঐতিহাসিক কারণেই আগে সম্ভব ছিল না।

মার্কসবাদের সিদ্ধান্ত জানলেই মার্কসবাদী হওয়া যায় না

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা আপনাদের কাছে বলে যেতে চাই। আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করাই হচ্ছে মার্কসবাদ। তাই মার্কসবাদের সিদ্ধান্তগুলো জানা থাকলেই মার্কসবাদকে আয়ত্ত করা যায় না। কেননা মার্কসবাদের সিদ্ধান্ত জানলেও যদি মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি আপনারা আয়ত্ত না করতে পারেন, তাহলে নতুন কোন সমস্যা বা পরিস্থিতির সামনে আলোকপাত করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে 'হিস্টরিক্যাল প্যারালাল' বা 'অ্যানালজি'র, অর্থাৎ, কোন একটি ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটি ঘটনাকে তুলনা করার পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আপনাদের কাছে

কোন গত্যন্তর থাকবে না। তাই একথা প্রতি মুহূর্তে আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন মার্কসবাদী মনীষী বা 'অথরিটি'র বক্তব্যগুলো মুখস্ত করা মার্কসবাদ চর্চা করা নয়। শুধু বই পড়ে মার্কসবাদ আয়ত্ত করা যায় না। মার্কসবাদের বই পড়া এবং মার্কসবাদের ওপর আলোচনা করার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই; কিন্তু সংঘর্ষের মধ্যে না পড়লে, নিজের মধ্যে ও পারিপার্শ্বিকের সাথে সংঘর্ষে না এলে এবং জীবনে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত সংগ্রাম পরিচালনা না করলে মার্কসবাদ আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীদের শুধু বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে তাই নয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রামাণিক সত্য, যুক্তিবিজ্ঞান ও ইতিহাসের উপর তাঁদের নির্ভর করতে হবে, অর্থাৎ 'ক্রাইটেরিয়া অভ প্র্যাকটিস'-এর ওপর তাঁদের দাঁড়াতে হবে। সেইজন্য আপনাদের প্রয়োজন বাস্তবে দায়িত্ব নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করা। একদিকে হাতে কলমে কাজ করা, অন্যদিকে যথাসম্ভব মার্কসবাদের ওপর বই পড়া ও আলোচনা করা, এই দুটো কাজই আপনাদের জীবনভোর চালিয়ে যেতে হবে। আপনারা প্রত্যেকে এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের সংস্কৃতিগত মান যতটা উন্নত করতে সক্ষম হবেন, যতটা উত্তরোত্তর উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের অধিকারী হতে পারবেন, এবং জ্ঞানকে যতটা শাণিত করতে পারবেন, মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রেও আপনারা তত বেশি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

এখন আলোচনা করে দেখা যাক, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কী বলছে, তার সিদ্ধান্তগুলো কী, সে সত্যি বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠেছে কিনা এবং মানবসভ্যতার সামনে যেসব সংকট দেখা দিয়েছে সেই সমস্ত সঙ্কটের ওপর সে আলোকপাত করতে পারে কিনা, ইত্যাদি। আমি আগেই বলেছি, সমস্যার মূল কারণ যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে সমাধানের রাস্তা আমাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে আর একটা কথাও বুঝতে হবে, তা হচ্ছে — বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকরা কী করেন? বিজ্ঞানের উপায়গুলোর দ্বারা, বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন প্রয়োগপদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে গবেষণার সাহায্যে তাঁরা অন্ধকারে আলো ফেলেন, অন্ধকার দূর করে সেগুলো সম্পর্কে সত্য জানতে চান। কিন্তু আমাদের জীবনের সমস্যাটা এমন নয় যে, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে তার উত্তর আমরা খুঁজে পেতে পারি। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, প্রত্যেক মানুষের সামনে, মানবসভ্যতার সামনে যে প্রশ্ন বা সংকট দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ আমাদের যে জীবনজিজ্ঞাসা, তার সামগ্রিক ও সঠিক উত্তর পেতে হলে বিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখা আমাদের সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু যেহেতু সমস্ত সমস্যাই আর পাঁচটি সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাই এগুলো কীসের দ্বারা সম্বন্ধিত, কীভাবে প্রভাবিত — এই বিষয়গুলো আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। সুতরাং এমন একটি বিজ্ঞান সমাজে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে যা এই সমস্যাজর্জরিত সমাজে সঠিক সমাধানের পথের ইঙ্গিত দিতে পারে। আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যা নাকি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মৌলিক সিদ্ধান্তগুলিকে সংযোজিত করেই গড়ে উঠেছে এবং সেই বিজ্ঞানই আমাদের সঠিক পথ দেখাতে পারে। তাই মার্কসবাদকে আমাদের একটি বিজ্ঞান হিসেবেই বুঝতে হবে — কতকগুলো শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় ধারণার ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ, যে 'কো-অর্ডিনেটেড নলেজ' বা 'কম্প্রিহেনসিভ সায়েন্স' হিসেবে মার্কসবাদ গড়ে উঠেছে তাকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ বিশেষ দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই মার্কসবাদের ধারণাগুলোকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মার্কসবাদ শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, এটা একটা বিশ্বদর্শন — 'ওয়ার্ল্ড আউটলুক' এবং 'গাইড টু অ্যাকশন'। তাই বিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষিত সত্য হিসেবেই আমি মনে করি যে, দুনিয়াতে এমন কোন সমস্যা নেই যা মার্কসবাদের আওতায় পড়ে না, বা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সমাধান করা যায় না। তাই আবার বলছি যে, মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতিকে আয়ত্ত করার কাজটি অত্যন্ত জরুরি।

সত্য জানার উপায়

এখন, সত্য জানার উপায় সম্পর্কে আমি দু'চারটি কথা বলতে চাই। সত্য জানার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির — তিনি যতবড় মানুষই হোন না কেন তাঁর — ব্যক্তিগত মনীষা বা ধীশক্তির ওপর আমরা নির্ভর করব, নাকি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইতিহাস ও যুক্তিবিজ্ঞানকে আমরা হাতিয়ার করে চলব? আমি মনে করি, এ প্রশ্নটা অত্যন্ত জরুরি। মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করাটাই

আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। কারণ, তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর, এক্ষেত্রে কোথাও যদি কোন ভুল হয়ও তাহলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথেই সে ভুলটাও একদিন না একদিন ধরা পড়বে। তাই ভুল হলে ভুল সংশোধন করে নেওয়ার রাস্তাও এটাই। কিন্তু ব্যক্তিচিন্তা বা ব্যক্তিমনীষার ওপর নির্ভর করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা শুধু যে বেশি থাকে তাই নয়, ব্যক্তিমনীষার ওপর গড়ে-ওঠা যে কোন সিদ্ধান্ত যে কোন সময় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। কেননা, যে কোন ব্যক্তি বা এমনকী মনীষীর চিন্তাও আসলে ব্যক্তিচিন্তা বা ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। সেক্ষেত্রে যে কোন মানুষের ব্যক্তিচিন্তাকে সত্য বলে গ্রহণ করার বিপত্তি হল যে, অপর কোন ব্যক্তির চিন্তার সাথে তার সরাসরি বিরোধ দেখা দিতে পারে। তাহলে এই অবস্থায় আমরা সত্য জানব কী করে? এহেন একটি পরিস্থিতিতে জবরদস্তি ও গায়ের জোর ছাড়া সত্য জানা তো দূরের কথা, কোন মীমাংসায় আসাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ইতিহাসে দেখা গেছে এই ধরনের ব্যক্তিচিন্তার ওপর গড়ে-ওঠা নানা মতবাদ গায়ের জোর, জবরদস্তি ও অন্ধবিশ্বাসের সাহায্যে সমাজে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।

আমরা সকলেই জানি, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সমাজের কোটি কোটি মানুষের কোটি কোটি ধরনের উপলব্ধি গড়ে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই কারণে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে সত্য একটি হলেও সত্যসংক্রান্ত ধারণা একাধিক থাকতে পারে। যেহেতু সমস্ত মানুষের মানসিক গঠন এবং চিন্তাপদ্ধতি একরকম নয়, সেই কারণেই সত্যসংক্রান্ত ব্যাখ্যা ভিন্ন হতে বাধ্য। অথচ, যে কোন বিষয় সম্পর্কে সত্য একটিই। কিন্তু, মজার বিষয় হ'ল, এই ধরনের ব্যক্তিচিন্তার যাঁরা প্রবক্তা তাঁদের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস যে, তাঁদের যাঁর যাঁর ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই ভাবনা-ধারণাগুলো সত্য এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য, সমাজের বিকাশের জন্যই তা বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ফলে, আপনারা বুঝতে পারছেন, এইসব বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে হলে আপনাদের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ, কোন্ কোন্ সামাজিক পরিস্থিতিতে এবং কী কী কারণে বিভিন্ন মতবাদ জন্ম নিল এবং সমাজে সেই সমস্ত মতবাদ কী কী ভূমিকা পালন করল এবং কেনই বা পরবর্তীকালে সেইসব ধারণাগুলো অকেজো হয়ে পড়ল — এই সবকিছুই বাস্তবের কষ্টিপাথরে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে এবং আপনাদের বুঝতে হবে। কিন্তু একটি বিষয় কোনমতেই আপনাদের গুলিয়ে ফেলা চলবে না যে, যেকোন বিষয় সম্পর্কে সত্য একটাই। একই বিষয় সম্পর্কে একাধিক বা বহু সত্যের ধারণা অলীক ছাড়া কিছুই নয়। একই বিষয় সম্পর্কে একই পরিস্থিতিতে এটাও সত্য, ওটাও সত্য — এমন হতে পারে না। এসব বিষয়গুলো এমন নয় যে, এগুলো বুঝবার জন্য খুব জ্ঞানের দরকার হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, বহু জ্ঞানী-গুণী হিসাবে খ্যাত এবং নাম করা লোকও সত্যের একাধিক রূপ (প্লুরালিজম্ অভ ট্রুথ)-এর সপক্ষেই বলে গেছেন।

ধরুন, বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা আলো জ্বালতে চাই বা পাখা চালাতে চাই। এই বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি একটাই। কোন দেশের ঐতিহ্যের তারতম্যের ওপর এর পার্থক্য হতে পারে না। যাঁরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তাঁরা বৈদ্যুতিক শক্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলোকে জানছেন এবং জেনে হাতে-কলমে সেগুলো কাজে লাগাচ্ছেন — তবে আলো জ্বলছে, পাখা চলছে। বৈদ্যুতিক শক্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের এই নিয়মকে অস্বীকার করে কেউ যদি নিজস্ব মনগড়া তত্ত্ব খাড়া করে কিছু করতে যান, তাহলে তাঁর পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে এমনকী বৈদ্যুতিক শক্ লেগে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই বলছিলাম, বিজ্ঞানের বিষয়গুলো এমন, যেখানে এধরনের তর্ক করা চলে না। বিজ্ঞানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সত্যই একমাত্র সত্য। সেই প্রমাণিত সত্যের সন্ধান আমরা পেতে পারি যদি বিজ্ঞানের ওপর আমরা নির্ভরশীল হই। তাই সত্যকে সঠিকভাবে জানতে হলে বিজ্ঞানসম্মত যে যুক্তির ধারা সেই ধারাকে আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। 'উই মাস্ট সাবমিট টু রিজন্'।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি

আমরা জানি, বিজ্ঞানের অগ্রগতি কোন জায়গায় থেমে থাকতে পারে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটতে থাকবে। আবার বস্তুজগতেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যে সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বস্তুকে নিয়ে আমরা আজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি, বস্তুকে জানতে চাইছি, সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলোও ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে শুধু তাই নয়, আমরা এই প্রক্রিয়াতে আজ যা

জানছি সে সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি বা ধারণাও ক্রমাগত সমৃদ্ধ ও পরিবর্তিত হচ্ছে — সেটাও এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। কারণ, একটা বিশেষ সময়ে মানুষের হাতে যতটুকু যন্ত্রপাতি বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপায় আছে তাকে প্রয়োগ করেই মানুষ সত্যকে জানছে, বা জানবার চেষ্টা করছে — যাকে আমরা পরীক্ষিত সত্য বলছি। এখন, ঐতিহাসিক কারণেই যন্ত্রপাতি বা পরীক্ষা-পদ্ধতির নানা প্রকার সীমাবদ্ধতার জন্য আগের সেই বিশেষ সময়ের জানাটা পরবর্তীকালে আরও উন্নত যন্ত্র ও উন্নত পরীক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তিতে জানার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা 'ইন্‌অ্যাডিকোয়েট' বা অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, তার জন্য অতীতের জানাটাকে কোনমতেই ভুল বলা চলে না। পার্থক্য শুধু এইখানে যে, আমরা অতীতের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পেরেছি, তাই সেই বিষয় সম্পর্কে উন্নত ও সমৃদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছি। এই প্রক্রিয়াতেই আমাদের ধারণাগুলো ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে, সমৃদ্ধ হচ্ছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, অতীতের কোন পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে আর একটা পরীক্ষিত সিদ্ধান্তের দ্বারাই একমাত্র পরিবর্তিত হতে পারে — কোন ব্যক্তির মনমাফিক চিন্তার দ্বারা নয়। এইভাবেই জ্ঞানজগত বিকশিত হচ্ছে, জ্ঞানের ক্রমাগত উন্মেষ ঘটছে। আর বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই প্রক্রিয়াতে মার্কসবাদের সিদ্ধান্তগুলোও ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে।

বস্তুজগত ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে এই যে পরিবর্তনের কথা বলা হ'ল, মনে রাখতে হবে যে, সমাজের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কেননা, সমাজেও প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, প্রতিদিন নিত্যনতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। জীবনকে কেন্দ্র করে, নীতি-নৈতিকতা, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থা, বিজ্ঞানসাধনা, জীবনসংগ্রাম, সব কিছুকে কেন্দ্র করেই নতুন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যা প্রতিদিন সমাজে দেখা দিচ্ছে। তাই মার্কসবাদী বিজ্ঞানেরও প্রতি মুহূর্তে অগ্রগতি বা ডেভেলপমেন্ট-এর প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। এই কারণেই মার্কসবাদকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করতে হবে, জীবনের গতির সঙ্গে তাল রেখে তাকেও এগোতে হবে, যেমনভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে চলেছে।

সত্যের রূপ ও অবস্থান সম্পর্কে এখানে আরও দু'একটি দিক আলোচনা করা দরকার। আগেই বলেছি যে, আমরা জানি বা না জানি, সত্য অবস্থান করে এবং যেকোন বিষয় সম্পর্কে সত্য একটিই। এই সত্য জানা মানে কী? সাধারণভাবে সত্য জানার মানে হচ্ছে দুনিয়া সম্বন্ধে, বস্তুজগৎ সম্বন্ধে, বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে সত্যোপলব্ধি। কিন্তু, একটা কথা এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, তা হচ্ছে, সত্য অবস্থান করে মানেই তা বিশেষভাবে অবস্থান করে। তাই সত্য মানেই হ'ল, বিশেষ সত্য, 'কংক্রিট ট্রুথ'। নির্বিশেষ সত্যের ধারণা অলীক কল্পনামাত্র। সত্য এই অর্থে বিশেষ সত্য যে, বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, বস্তুর ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই সত্য অবস্থান করে। অর্থাৎ, বস্তুর সূক্ষ্মকণাই হোক, বা বিশেষ কোন ঘটনাই হোক, তার অবস্থানের অর্থই হচ্ছে, তা বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করে। ফলে, বস্তুর অবস্থান যেখানে বিশেষ, সেখানে সত্যও বিশেষ সত্য, 'কনক্রিট' বা 'পারটিকুলার ট্রুথ' হতে বাধ্য। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে অথবা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করেই সেই সত্য সম্পর্কে আপনাদের বিশেষ ধারণা গড়ে তুলতে হবে। সত্য সম্পর্কে আপনাদের ধারণা যত বেশি 'কংক্রিট' হবে, সেটা তত বেশি সৃজনশীল ও ক্রিয়াশীল হবে, আপনারা যে কোন সমস্যার গভীরে তত বেশি প্রবেশ করার ক্ষমতা অর্জন করবেন। বিপরীত দিকে সত্য সম্পর্কে আপনাদের ধারণা যত বেশি ভাসাভাসা হবে তত বেশি সেটা অকার্যকরী হবে।

এখানে আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার। তা হচ্ছে, পরিস্থিতি পাল্টালে সত্যের রূপও পাল্টায় — তাই কোন বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত সত্যধারণাও পাল্টায়। সেইজন্যই 'অ্যাবসলিউট' বা শাশ্বত সত্যের ধারণা অচল। সত্য নেই তা নয়, কিন্তু শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই। শাশ্বত সত্যটাই মহা মিথ্যা যা জীবনের সত্যকেই গুলিয়ে দিচ্ছে। সত্য যেমন বিশেষ সত্য, শাশ্বত বা নির্বিশেষ সত্য বলে যেমন কিছু অবস্থান করে না, তেমনই মনে রাখতে হবে, পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় সত্যের ধারণা হল আপেক্ষিক সত্য বা 'রিলেটিভ ট্রুথ'। এই কারণেই সত্যের ক্ষমতা অমোঘ এবং কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিক সত্য ধারণা গড়ে তুলতে না পারলে অন্ধকারে হাতড়ানো ছাড়া আমাদের অন্য কোন গত্যন্তর থাকে না। আপনারা যারা সমাজকে পাল্টাতে চান, দুনিয়াকে পাল্টাতে চান, এই পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে চান, তাঁদের জীবনভোর সত্যের সাধনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এই কারণেই শোষিত, নিপীড়িত মানুষের ক্ষেত্রে সত্যসাধনার প্রশ্নটিও অত্যন্ত জরুরি। কেননা, সত্য হ'ল অমোঘ সত্য, 'ডিসিসিভ ট্রুথ'। অন্যদিকে এক-একটি বিশেষ মুহূর্তে সত্য

হ'ল কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য — অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট ধারণার সেখানে স্থান নেই।

আর একটা কথা এখানে আপনাদের মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, দুনিয়াতে অজ্ঞেয় বলে কিছু থাকতে পারে না। বিজ্ঞান এমন চিন্তাকে সঠিক বলে মনে করে না। দুনিয়াতে এমন কিছু থাকতে পারে না যা নাকি মানুষের জানার অতীত, যা কোনদিন জানতে পারা যাবে না। না, এমন কোন কিছু দুনিয়াতে অবস্থান করতে পারে না যা মানুষ কোনদিন জানতে পারবে না। একথা যেমন সত্য, আবার এ কথার মানে এরকম নয় যে, কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে সবকিছু জানতে পারে। বাস্তবটা হল এই যে, বিজ্ঞান ও মার্কসবাদ যেমন নিত্যনতুন বহু সমস্যার উত্তর দিচ্ছে, আবার এই পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় যেখানে সবকিছুর মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে, সেখানে প্রতি মুহূর্তেই তার সামনে কিছু না কিছু অজানা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তাই সমস্ত কিছুই জ্ঞেয়, সবকিছুই একদিন না একদিন জানতে পারা যাবে। কিন্তু কোন এক বিশেষ মুহূর্তে সবকিছুই জানতে পারা যাবে — ব্যাপারটা এমন নয়। আসলে এটাই স্বাভাবিক। ক্রমপরিবর্তনশীল দুনিয়ায় এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। ফলে জানা ও অজানার নিয়ত সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব থাকবেই। আর এই দ্বন্দ্বের ফলেই জানারও শেষ নেই। জ্ঞানচর্চা কোথায়ও এসে থেমে থাকতে পারে না। যে জিনিস পূর্বে জানা ছিল না, সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে পেতে অনেক নতুন অজানা প্রশ্ন মানুষের সামনে ভীড় করে দেখা দেবে। এভাবেই সমাজ, সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে চলেছে।

তাহলে, আপনারা দেখতে পারছেন যে, সবকিছুই যেখানে পরিবর্তনশীল সেখানে কোনও সত্য স্থবির বা শাশ্বত হতে পারে না, অর্থাৎ, চিরন্তন সত্য বা শাশ্বত সত্য বলে কিছু থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গটি নতুন করে আবার উল্লেখ করলাম একটি কারণে, তা হচ্ছে — একথা শোনবার পর বিজ্ঞানের ছাত্ররা কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, বিজ্ঞানে অনেক ক্ষেত্রে যে 'কনস্ট্যান্ট' বা ধ্রুবকের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় সেই 'কনস্ট্যান্ট' সম্পর্কে সঠিক ধারণা কী হবে? এই কনস্ট্যান্ট কথাটার মানে হল, একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ স্থানে, একটা বিশেষ ক্ষেত্রে, একটা বিশেষ ব্যাপারে এটা কনস্ট্যান্ট — অর্থাৎ, at a given time, space, field and in the case of a given phenomenon it is constant। এর বেশি কিছু নয়। বিজ্ঞানের ছাত্ররা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন উদাহরণকে যদি বিচার করেন, তাহলে তাঁরা নিজেরাই এর অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝে নিতে পারবেন।

বিজ্ঞান ও মার্কসবাদের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলোকে বাদ দেওয়া চলে না

এখন, বস্তুজগত ও সমাজজীবনের পরিবর্তনশীলতার প্রশ্নে আবার ফিরে আসা যাক। আপনারা আগেই শুনেছেন, বস্তুজগত ও সমাজের পরিবর্তনের নিয়মকে জানতে গিয়ে বিজ্ঞান ও মার্কসবাদের ধ্যানধারণাগুলো ক্রমাগত আরও উন্নত হচ্ছে, সমৃদ্ধ হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে। এটা বাস্তব সত্য এবং একে অস্বীকার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান ও মার্কসবাদের ক্ষেত্রে কতগুলো বিশেষ সিদ্ধান্ত, ধারণা বা কন্‌সেপ্ট আছে যেগুলো বিজ্ঞান ও মার্কসবাদের 'ফান্ডামেন্টালস্' বা ' বেসিক টেনেটস্' হিসেবে স্বীকৃত। দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সেগুলো বিজ্ঞানের মৌলিক দিক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বস্তুর (matter) যে ভর (mass) আছে, শক্তি (energy) আছে, বা বস্তুকণা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন সেটা যে কিছু না কিছু ব্যাপ্তি বা স্থানকাল (space-time) জুড়ে থাকে (occupy করে), এবং বস্তুমাত্রই যে নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং সেই পরিবর্তন নিয়ম মেনে চলে — বস্তুর চরিত্র সম্পর্কে আজ এইসব যে সমস্ত মৌলিক ধারণা গড়ে উঠেছে সেটা বিজ্ঞানের কোন ছাত্রই অস্বীকার করতে পারেন না। যেকোন কারণে বা বিজ্ঞানের উন্নতির নাম করে যদি কেউ এইসব মৌলিক ধারণা বা ফান্ডামেন্টাল কন্‌সেপ্টকে অস্বীকার করতে চান, তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে, এহেন চিন্তা বিজ্ঞান-বিরোধী, বিজ্ঞানের সাথে এর সম্পর্ক নেই।

আবার ধরুন, আমরা সকলেই জানি, ইতিহাসের গতিপথে একটা সময়ে এসে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে এবং সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের পথ বেয়েই এই শ্রেণীবিভক্তির রূপ ও চরিত্রের বহু পরিবর্তন হয়েছে ঐতিহাসিক কারণেই। এখন সমাজব্যবস্থার পার্থক্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এই শ্রেণীবিভক্তির রূপ যাই হোক, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটতে পারে না — ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এটা একটা মৌলিক সিদ্ধান্ত। এখন, কোন মার্কসবাদী নেতা যদি দুনিয়ার পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কোনও

একটি বিশেষ সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ হলেও সেখানে শ্রেণীদ্বন্দ্বের নিয়ম কাজ করে না, তাই শ্রেণীসংগ্রামের নীতি সেখানে অচল — তাহলে আর যাই হোক, এহেন ধারণাকে সঠিক মার্কসবাদী চিন্তা বলে গ্রহণ করা চলে না। পরিবর্তনশীলতার নাম করে উপস্থিত করা হলেও এই চিন্তা মার্কসবাদের মৌলিক সিদ্ধান্তের বিরোধী।

সমাজে প্রচলিত বিজ্ঞান-বিরোধী নানা চিন্তার ফলে, বা শোষক সম্প্রদায়ের স্বার্থে বিজ্ঞান-চিন্তাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলে যেমন বিজ্ঞানের অগ্রাভিযান সাময়িকভাবে হলেও ক্ষতিগ্রস্ত বা ব্যাহত হয় — মার্কসবাদের অগ্রগতির ইতিহাসেও আমরা অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখেছি। বিভিন্ন দেশে যাঁরা মার্কসবাদী বলে পরিচিত তাঁরা মার্কসবাদী দর্শন বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন কিনা, জীবনে এই বিজ্ঞানকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারছেন কিনা, correct process of thinking and correct process of movement অনুসরণ করতে পারছেন কিনা তার ওপর নির্ভর করছে মার্কসবাদী আন্দোলন কতটা ত্বরান্বিত হবে, নাকি তার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি হবে।

কারও পছন্দ-অপছন্দের ওপর মার্কসবাদ চর্চা নির্ভর করতে পারে না

সুতরাং মার্কসবাদ সম্পর্কে আপনাদের ধারণাগুলো খুবই স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। মার্কসবাদ বা বিপ্লবী জীবন গ্রহণ করা সম্পর্কে কারোর দৃষ্টিভঙ্গি এরকম হতে পারে না যে, মার্কসবাদ তাঁর পছন্দ হয় বলেই তিনি মার্কসবাদী — এটা তাঁর 'ন্যাক' (knack)। যেমন কেউ হয়ত খেলা পছন্দ করেন সেইজন্য তিনি খেলোয়াড়, কারও ডাক্তারি ভালো লাগে তাই তিনি ডাক্তার, আবার কেউ একই কারণে ইঞ্জিনিয়ার বা প্রফেসর। সেইরকম, কারোর কাছে মার্কসবাদ ভালো লাগে, মার্কসবাদের ওপর তাঁর আকর্ষণ, তাই তিনি মার্কসবাদী — এভাবে ভাবাটা ভুল। বুঝেই করুন আর না বুঝেই করুন, এই ধরনের চিন্তা দেখা দিলে মার্কসবাদ বা বিপ্লবী রাজনীতির যে অপরিসীম গুরুত্ব তাকে খাটো করে দেখা হয়, অন্যান্য সমস্ত পেশার (profession) সাথে তাকে একাকার করে ফেলা হয়। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আমাদের সামনে অনেকগুলো বিকল্প (option) আছে, আমরা তার মধ্যে যেকোন একটা বিকল্প হিসেবে মার্কসবাদকে বেছে নিয়েছি।

আর একদিক থেকে বিষয়টাকে আমি আপনাদের সামনে রাখছি। এই সমাজে একজন মানুষ বৈজ্ঞানিক হন, সাহিত্যিক হন, খেলোয়াড় হন — ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা প্রফেসর যাই হন না কেন, তিনি এই সমাজেরই মানুষ, সমাজের সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করে তিনি চলতে পারেন না। এই যে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা, তিনি সেই সমাজেরই একজন নাগরিক। এখন প্রশ্ন হ'ল, এই সমাজের একজন মানুষ হিসেবে তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধের ধারণা কী সেটা কি তিনি ভেবে দেখেছেন? যে ধারণা নিয়ে তিনি চলছেন, জীবনে যে মূল্যবোধ তিনি প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত করছেন, তাঁর নিজের জীবনে এবং সমাজে তার প্রতিক্রিয়া কী বা তাৎপর্য কতটুকু — এসব বিষয় সম্পর্কে তিনি কি সচেতন? ব্যাপারটা এমন হতে পারে না যে, তিনি তাঁর ভাবনাচিন্তার দ্বারা সমাজে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করছেন না। তিনি চান বা না চান, তাঁর চলাফেরা, সমাজে তাঁর অবস্থান, কোন না কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। হয় তিনি অপরের হাতের যন্ত্র বা পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন, নিজেকে প্রতি মুহূর্তে ভুল বোঝাচ্ছেন, নাহয় এই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যতটুকুই হোক তিনি সংগ্রামী ভূমিকা পালন করছেন। এই দুটোর যেকোন একটা তিনি করছেন। এর কোনটাই তিনি করছেন না, এমন হতে পারে না। তিনি এ সম্পর্কে সচেতন নয় বলে যদি ভাবেন, তিনি এ ব্যাপারে কোন ভূমিকাই পালন করছেন না, তাহলে সেটা হবে অলীক কল্পনামাত্র। আজকের এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, এই শোষণমূলক ব্যবস্থায় কেউই নিজের গা বাঁচিয়ে চলতে পারেন না। কেউ ভাবতে পারেন যে, তিনি খেলোয়াড়, তিনি খেলাধূলা করেন, ফলে শোষণ-নিপীড়ন প্রভৃতির সাথে তাঁর সম্বন্ধ কী? কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলেই তিনি ধরতে পারবেন, সমাজের সব কিছুর সাথেই প্রতিটি মানুষের সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ কীভাবে আছে সেটা সকলকেই বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। এইটে বোঝার চেষ্টা না করে ফাঁকির যুক্তিতে কেউ বেরিয়ে যেতে পারবেন না। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, নিজে না চাইলে কাউকে জোর করে কোন জিনিস বোঝানো যাবে না, বা কাউকে জোর করে কিছু করানোও যাবে না — সে প্রশ্ন আসেই না। কিন্তু প্রত্যেকেরই একথা জেনে রাখা দরকার যে, অজ্ঞাতসারে হলেও কেউ হয়তো নিজের কাজের দ্বারা এমন শক্তির হাতকে শক্তিশালী করছেন যাঁরা এই শোষণমূলক যন্ত্রটাকেই টিকিয়ে রাখার কাজে নিয়োজিত। এক্ষেত্রে কেউ মনে করতে পারেন যে, তিনি তাঁর

নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা নিয়ে চলছেন — এতে কার কী বলার থাকতে পারে? কিন্তু একটু খেয়াল করলে তিনি ধরতে পারতেন যে, এই ধরনের চিন্তার দ্বারা ইতিহাসে মানুষের যে ভূমিকা তাকেই তিনি অস্বীকার করে বসলেন। কেননা, একথা সকলেরই জানা আছে যে, প্রাণীজগতের অন্যান্য জীবজন্তুর সাথে মানুষের পার্থক্য এইখানে যে, অন্যান্য জীবজন্তু যেখানে সকলেই প্রাকৃতিক নিয়মের দাস, পরিবেশ তাদের যেভাবে চালায় তারা সেভাবে চলে, সেখানে মানুষই হচ্ছে একমাত্র ব্যতিক্রম। মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের দাস থাকতে চায়নি, থাকেনি। সে প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা করছে, প্রাকৃতিক নিয়মকে জেনে মানুষের কল্যাণে তাকে ব্যবহার করে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ঘটিয়েছে। সমাজ ও সভ্যতার এই অগ্রগতির পথে সে যেমন বস্তুগত (material) উৎপাদন ঘটিয়েছে, তেমনি ভাবগত (spiritual) উৎপাদনও ঘটিয়েছে। তাই মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার একটা বিরাট তাৎপর্য আছে। মানুষের জীবনের মূল্য অনেক। তাই বলছিলাম, মানুষ হিসেবে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও জীবনের মূল্যকে অস্বীকার করা চলে কি? তবে তো একজন মানুষের মানুষ না হলেও চলত। সুতরাং কেউ খেলোয়াড় হন, ইঞ্জিনিয়ার হন বা যাই হন না কেন, জীবনের মূল সমস্যাকে তাঁকেও বুঝতে হবে। আর, এইসব সমস্যাকে বোঝবার ও জানবার জন্য মার্কসবাদ আমাদের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়, অত্যন্ত জরুরি।

বস্তুজগতের অবস্থান চেতনানিরপেক্ষ

দর্শনের আরও বহু বিষয় আছে, যেগুলো সম্পর্কেও আপনাদের পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা দরকার। ধরুন, এই যে বস্তুজগৎ, সেটা কি মানুষের মনের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল? অর্থাৎ, আমরা মনে করছি বলেই কি এই বস্তুজগত অবস্থান করছে? নাকি, বস্তুজগতের অবস্থান চেতনানিরপেক্ষ — independent of human consciousness ? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে হলেও আমাদের বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হবে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং ইতিহাস ও বিজ্ঞান থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মহাজাগতিক বিবর্তনের (cosmic evolution-এর) পথ বেয়ে বিশেষ বিশেষ স্তরে প্রথমে প্রাণের স্পন্দন, উদ্ভিদ, তারপরে বিভিন্ন জীবজন্তুর সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ ও মানুষের মনের জন্ম হয়েছে। কতগুলো নিষ্প্রাণ বস্তু — যেগুলোকে বিশেষ করে আমরা অজৈব পদার্থ (inorganic matter) বলি — পরিবর্তনের পথ বেয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যখন অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তখনই জৈব পদার্থের (organic matter-এর) সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জৈব পদার্থ মাত্রই প্রাণসম্পন্ন বস্তু, এভাবে যদি কেউ ভাবেন তাহলে ভুল করা হবে। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা হচ্ছে, দীর্ঘ পরিবর্তনের পথ বেয়ে মূলত জৈব পদার্থের মিলনের মধ্য দিয়েই প্রাণসম্পন্ন বস্তুকণা বা জৈব কোষের সৃষ্টি হয়েছে। আর, এইসব জৈব কোষের দীর্ঘ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এক এক সময়ে বিভিন্ন প্রাণীদেহের সৃষ্টি হয়েছে। আর, প্রাণীদেহের বিকাশের সুদীর্ঘ পথ বেয়ে ঘটেছে মানবদেহের অভ্যুত্থান। মানবদেহের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল, মানুষের মস্তিষ্কের গঠন। কেননা, মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যেই রয়েছে তার চিন্তা করার ক্ষমতা। অন্যান্য জীবজন্তুর সাথে মানুষের এখানেই মৌলিক পার্থক্য। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে মানুষের দেহ এবং বিশেষ করে মানুষের মস্তিষ্কের উন্নত গঠন, তার enlarged and developed cerebral cortex-এর অবস্থান সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি। এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক এমন একটি ক্ষমতা অর্জন করেছে যাকে ইংরেজিতে বলা হয় power of translation of the human brain। এই ক্ষমতাই মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা জুগিয়েছে, মানুষের মনের সৃষ্টি করেছে। তাহলে আপনারা দেখতে পেলেন, বস্তুর পরিবর্তনের ধারায় প্রাণহীন বস্তু থেকে প্রাণের সম্ভাবনাপূর্ণ বস্তু, তা থেকে প্রাণসম্পন্ন বস্তু এবং সেই পথ বেয়ে দুনিয়ায় বিভিন্ন প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা যখন বস্তুজগতের পরিবর্তনের কথা বলছি এবং বাস্তবিক পক্ষে যেকোন পরিবর্তনের ধারাই আমরা বলি না কেন তাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় ভালো করে বুঝতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, বস্তুজগতে যে পরিবর্তন ঘটে সেখানে দু'ধরনের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। প্রথমত প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তন। প্রতি মুহূর্তে বস্তুর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেটা সাধারণত আমাদের খালি চোখে ধরা পড়ে না। বস্তুর প্রতি মুহূর্তের এই পরিবর্তনকে বলা হয় ক্রমপরিবর্তন, ধীরে ধীরে পরিবর্তন, পরিমাণগত পরিবর্তন ইত্যাদি, বা ইংরেজিতে একে বলা হয় evolutionary, gradual, slow বা quantitative change। বস্তুর দ্বিতীয় আর এক ধরনের পরিবর্তন ঘটে যেটা এই প্রথম ধরনের পরিবর্তনেরই পরিণতি। ধীরে

ধীরে পরিমাণগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে বস্তুর পরিবর্তনের রূপ ও চরিত্র এমন একটা স্তরে পৌঁছায় যখন সেই পরিবর্তন সহজেই ধরা পড়ে, বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এই দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় হঠাৎ পরিবর্তন, বৈপ্লবিক পরিবর্তন, গুণগত, বা আমূল পরিবর্তন — ইংরেজিতে বলা হয়, abrupt, revolutionary, qualitative বা radical change। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই প্রথম ও দ্বিতীয় পরিবর্তনকে কখনও কখনও 'কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড ডিসকন্টিনিউয়াস চেঞ্জ'ও বলা হয়। পরিমাণগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে যখন বস্তু 'ট্রানজিশনাল স্টেজ' বা 'নোডাল পয়েন্ট'-এ পৌঁছায় তখনই বস্তুর এই গুণগত পরিবর্তন ঘটে। তাহলে পরিবর্তনের গোটা কাঠামোকে বুঝতে হলে আমাদের এই দুই ধরনের পরিবর্তনকেই বুঝতে হবে।

একথা সকলেই জানেন যে, প্রাণ বা প্রাণীজগতের পরিবর্তনকে ডারউইন তার বিবর্তন তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস দু'জনেই ডারউইনের এই আবিষ্কার খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন এবং প্রাণের সৃষ্টি বা প্রাণীজগতের বিকাশের ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব যেভাবে তদানীন্তন ভাববাদী চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের যে বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে তা থেকে আজ একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র ক্রমপরিবর্তনই নয়, এর সাথে গুণগত, মৌলিক বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে যুক্ত করেই যেকোন বস্তুর পরিবর্তনের গোটা কাঠামোকে বুঝতে হবে। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তকে খেয়ালে রাখলে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ, জৈব পদার্থের বিকাশের প্রক্রিয়ায় প্রাণের সম্ভাবনাপূর্ণ পদার্থ এবং সেই পদার্থের মিলনের মধ্য দিয়ে প্রাণ বা প্রাণীজগতের আবির্ভাবের বিষয়টিকে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার সাহায্যে বুঝতে অসুবিধে হবে না।

মন কী ?

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও আমাদের মনে রাখা দরকার। সেটা হ'ল বস্তুগত বা যেকোন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও মিলনের মধ্য দিয়েই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। অর্থাৎ, ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাত ও মিলন হচ্ছে বস্তুজগতের বৈশিষ্ট্য। বস্তুর এই দ্বন্দ্বের দুটো রূপ — অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব। যেকোন বস্তু বা যেকোন সত্তার নিজের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং মিলনের প্রক্রিয়া কাজ করে তাকেই বলা হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। আবার বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত বা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও মিলনের যে প্রক্রিয়া কাজ করে তাকে বলা হয় বহির্দ্বন্দ্ব। বস্তুর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বস্তুর পরিবর্তন সূচিত হয়। বস্তুর পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে উদাহরণসহ কিছুটা আলোচনা আমি পরে বস্তুর পরিবর্তনের তিনটি মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করার সময় করব।

এখন আমি আপনাদের কাছে অন্য একটি বিষয়ে আলোচনা করছি। মন আগে না বস্তু আগে, অর্থাৎ মন এবং বস্তুর মধ্যে কোনটা 'প্রায়র্' এ নিয়ে দর্শনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে বহু বিতর্ক চলেছে। কিন্তু বিজ্ঞানে এই 'প্রায়রিটি'-র বিষয়টি আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বস্তু যে চেতনা নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে এ বিষয়টি আজ তর্কাতীত। আমরা আর একটি বিষয়ও জানতে পেরেছি যে, পঞ্চে ন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্ব ও বাস্তব পরিবেশ মানুষের মস্তিষ্কে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করছে সেটাই মানুষের মস্তিষ্কের যে বিশেষ ক্ষমতা — যাকে power of translation of the human brain বলা হয় — তাকে ভিত্তি করেই চিন্তা ও ভাবের জন্ম হচ্ছে। তাহলে মন কী? মন হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের এক বিশেষ ধরনের ক্রিয়ার ফল, অর্থাৎ, mind is a particular function of the human brain। অথবা বলা হয়, objective world, by the process of interaction with the human brain and being translated into human reasoning, is effecting the human mind। অর্থাৎ, মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গঠনের মধ্য দিয়ে যেটা সৃষ্টি হ'ল, বাস্তব জগতের সাথে সেই মস্তিষ্কের ঘাত-প্রতিঘাতের পথে যেটা বিকশিত হ'ল — সেটাই হ'ল মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা। অন্যান্য জীবজন্তুর ক্ষেত্রে যেটা ঘটে সেটা হ'ল, তাদের স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্কের সাথে প্রকৃতির সংঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া — যাকে বলা হয় 'রিফ্লেক্স অ্যাকশন'। মানুষের ক্ষেত্রেও এই ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা রিফ্লেক্স অ্যাকশন ঘটে। কিন্তু, তার সাথে যেটা যুক্ত হয় সেটা হল হিউম্যান ব্রেন-এর একটা 'পাওয়ার অভ অ্যাডাপটেবিলিটি' যেখানে 'প্রসেস অভ এলিমিনেশন' কাজ করে এবং 'পাওয়ার অভ ট্রানস্লেসন' আছে বলেই তার সাহায্যে idea বা ভাবের সৃষ্টি হয়। এই যে ক্ষমতা বা প্রক্রিয়া এটা শুধু মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়ার মধ্যেই কাজ করে। প্রাণীজগতের সমস্ত মস্তিষ্কই ক্রিয়া করে, কিন্তু মস্তিষ্কের যে পাওয়ার অভ ট্রানস্লেসন-এর

পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হ'ল, সেটা একমাত্র মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষেত্রেই কাজ করে। অর্থাৎ, মানুষের মস্তিষ্কই একমাত্র এই ক্ষমতার অধিকারী। ফলে, মানুষই একমাত্র জীব যে অন্যান্য জীবজন্তুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল, প্রকৃতিকে জয় করতে সক্ষম হ'ল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হ'ল, ন্যায়-অন্যায় নীতি-নৈতিকতার ধারণা জন্মাল এবং সভ্যতার অগ্রগতি ঘটল।

সুতরাং, আবার বলছি, চিন্তা ও চৈতন্যের ফল বস্তু নয়। অথবা, আদিকাল থেকেই চিন্তা, চৈতন্য এবং বস্তু পাশাপাশি থেকেছে — এ ধারণাও সত্য নয়। ইতিহাস সেকথা বলে না। চিন্তার অস্তিত্ব মানুষের অস্তিত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ, পৃথিবীর ইতিহাসে যতদিন পর্যন্ত মানুষ নামক জীবটির আবির্ভাব ঘটেনি, ততদিন চিন্তা, মন এবং পরবর্তীকালে নীতি-নৈতিকতার, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণারও সৃষ্টি হয়নি। তাই চিন্তা বা চৈতন্যের অস্তিত্ব আদিকাল থেকে প্রবহমান ছিল এহেন ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অথচ, অনেক চিন্তাবিদ্ আছেন যাঁরা ইতিহাসের এই বাস্তব সত্যকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। আমি সাধারণ মানুষদের কথা বলছি না। এমন অনেক চিন্তাবিদ্ আছেন যাঁরা বিজ্ঞানকে নিয়েই চলতে চেয়েছেন, তাঁদের অনেকের কাছে মানুষের মন বা চিন্তা গড়ে ওঠার এই বাস্তব ইতিহাসটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। বার্ট্রান্ডরাসেল, জাঁ পল সার্ত্রে বা অলডাস হাক্সলে-র মত বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যজগতের যাঁরা দিকপাল তাঁদের অনেকেই এই সত্যকে মেনে নিতে পারেননি। এঁদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলে যেটা বেরিয়ে আসে — কথাটা তাঁরা সরাসরি এমন ভাষাতেই বলেছেন বিষয়টা সেরকম নয় — তাহ'ল, এতটুকু এই মস্তিষ্ক এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সমস্যাকে অনুধাবন করছে, এও কি সম্ভব? সার্ত্রের বক্তব্য থেকে তো এমন ধারণাই ফুটে উঠেছে যে, চিন্তা বা মনন বা তার যে উপাদান — যাকে তিনি 'অ্যান এলিমেন্ট অভ ইনটেলেক্ট' হিসেবে বলতে চেয়েছেন, সেটা বস্তুসৃষ্টও নয় এবং বস্তুবহির্ভূত ও পুরোপুরি বস্তুনির্ভরও নয়। তাঁর মতে অনন্তকাল ধরে বস্তুর মধ্যেই এ জিনিস 'এলিমেন্ট অভ থিকিং'-এর রূপে নিহিত রয়েছে। এঁদের এ ধরনের চিন্তা সাংস্কৃতিক জগতে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে সেসব আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে, ইতিহাস ও বাস্তবকে অস্বীকার না করে এইসব চিন্তাবিদ্দের মতকে সত্য বলে মেনে নেবার কোন উপায় নেই। তাছাড়া আর একটু বিশ্লেষণ করলেই আপনারা দেখতে পাবেন যে, এসব চিন্তাবিদেরা কার্যত 'অ্যাবসলিউট ইনডিপেন্ডেন্স অভ হিউম্যান থিংকিং'-এর ধারণাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং এহেন চিন্তার দ্বারা না চাইলেও 'রেক্লেস্ সেন্স অভ লিবার্টি'-র ধারণাকেই গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের ভাবখানা এমন যেন মানুষের চিন্তা, বস্তুজগত, বাস্তব পরিবেশ (material condition)-এর দ্বারা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই বলছিলাম, দেখুন, এতবড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অজ্ঞাতেই কত সহজেই তাঁরা বিজ্ঞান-বিরোধী চিন্তার শিকার হয়ে গেছেন।

যাই হোক্, সবসময় আপনাদের একথাটা মনে রাখা দরকার যে, সমাজে যে বিভিন্ন মতবাদ ও ভাবনাধারণা গড়ে ওঠে তার পেছনে একটা বাস্তব ভিত্তি কাজ করে থাকে। অর্থাৎ, বিশেষ কোন চিন্তা গড়ে ওঠার মত উপযুক্ত বাস্তব পরিবেশ (material condition) দেখা না দিলে সমাজে সেই চিন্তা জন্ম নিতে পারে না। মানুষ যখন কোন ভ্রান্ত চিন্তাও করে, সেটাও এজন্য করে যে, বস্তুজগৎ ও সামগ্রিক বাস্তব পরিস্থিতিতে সেই ভ্রান্ত চিন্তা করার সুযোগ বা কারণ নিহিত ছিল। তাই বস্তুজগৎ এবং বাস্তব পরিস্থিতি থেকে মানুষের চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যাঁরা বলেন, ভগবানের ভাবনাচিন্তাই মানুষের চিন্তায় প্রতিফলিত হচ্ছে (thinking is the contemplation of God), তাঁদের আমরা ভেবে দেখতে বলছি যে, আসলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। মানুষের মস্তিষ্কই ঈশ্বরচিন্তার আধার। কেননা, মানুষের মস্তিষ্কবহির্ভূত চিন্তাসত্তা বা চৈতন্যের অস্তিত্ব দুনিয়ার ইতিহাসে কখনও কোথাও পাওয়া যায়নি। সমাজে যত চিন্তা এসেছে, সেটা ঈশ্বরচিন্তাই হোক, বা অন্য কিছু হোক — সঠিক হোক বা বেঠিক হোক — এই চিন্তার আধার হ'ল মানুষের মস্তিষ্ক। তাই বলা হয়, human brain is the organ of thought। ইতিহাস ও বিজ্ঞান থেকে এই সত্যই বেরিয়ে এসেছে। সুতরাং, মানুষ চিন্তা করছে বলেই বস্তুজগৎ অবস্থান করছে — এটা সঠিক নয়। বরং বস্তুজগতের বিকাশ ও অগ্রগতির পথেই মানুষের মস্তিষ্কের জন্ম হয়েছে, যে মস্তিষ্ক বহির্বিশ্ব ও বাস্তব পরিবেশের সাথে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে — যেটা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মারফত যোগাযোগের ফলেই সম্ভব হয়েছে — চিন্তা বা ভাবের জন্ম দিয়েছে। কোনও কোনও দার্শনিক এই বিষয়টাকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, matter is thinking, অর্থাৎ, বস্তুই চিন্তা করছে।

মানুষের আদিম চিন্তা ছিল বস্তুতান্ত্রিক

আমি এর আগে অন্যান্য বহু আলোচনায় বলেছি যে, আদিম মানুষ বস্তুচিন্তাই করেছে — নির্বস্তু বা বস্তুনিরপেক্ষ কোন সত্তার চিন্তা করেনি। মানুষের চিন্তার যখন প্রথম স্ফূরণ হয়, অর্থাৎ, যখন সে চিন্তা করতে শিখেছে তখন সে যা কিছু চিন্তা করেছে সেটা বস্তুচিন্তাই করেছে। বস্তুবহির্ভূত কোন সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণাই আদিম অবস্থায় মানুষের ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না। তাই মানুষের আদিম চিন্তা বা তার চিন্তাশক্তির প্রথম স্ফূরণের সময় বস্তু ছাড়া সে কিছু ভাবতে পারত না। এই কারণেই বলা হয় যে, মানুষের আদিম চিন্তা হল বস্তুতান্ত্রিক, তার রূপ যাই হোক না কেন। এখন, বিচার করে দেখা যেতে পারে, সমাজে ঈশ্বরচিন্তার জন্ম হ'ল কী করে? যেসব কমরেড মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সংক্রান্ত এইসব আলোচনা এর আগেকার ক্লাসগুলিতে শুনেছেন, তাঁরা এই বিষয়গুলো জানেন। কিন্তু যাঁরা নতুন এসেছেন তাঁদের কথা মনে রেখেই আমাকে নতুন করেই সেইসব আলোচনা করতে হচ্ছে।

যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র তাঁরা জানেন যে, আদিম মানুষ মন্ত্রতন্ত্রের (magic-এর) স্রষ্টা। মানুষ আদিম অবস্থায় মন্ত্রতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল বস্তুকে বশীভূত করার জন্য, বস্তুর অজ্ঞাত শক্তি, অনিষ্টকর শক্তিকে জয় করবার উদ্দেশ্যে। ইতিহাস থেকে আমরা যা পেয়েছি, সেটা হ'ল, আদিম মানুষের মন্ত্রতন্ত্র (magic) হচ্ছে বস্তুকে জানবার প্রথম প্রচেষ্টা। সেই কারণেই আদিম মানুষের মন্ত্রতন্ত্রকে বলা হয় 'বিজ্ঞানের আদি' বা 'আদিম বিজ্ঞান' (primitive science)। বিজ্ঞান যদি বস্তুকে জানবার প্রচেষ্টা থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে সেই প্রচেষ্টা আদিম মানুষ থেকে শুরু হয়েছে। সেদিনকার এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আদিম মানুষের পক্ষে বস্তুকে বোঝাও সম্ভব হয়নি, জানাও সম্ভব হয়নি, বশীভূত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এইভাবেই আদিম মানুষ বস্তুকে বশীভূত করার চেষ্টা করেছে। মানুষ সেদিন বস্তুকে কতটা জানতে পেরেছে কি পারেনি, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের (magic-এর) সাহায্যে সে কী করতে চেয়েছে? এটা বুঝতে হলে আদিম মানুষের সামনে সেদিন সমস্যাগুলো কোন্ ধরনের ছিল সেটা আপনাদের মনে রাখতে হবে। ধরুন, সেই আদিম অবস্থায় একটা পাথর পড়ে গিয়ে মানুষকে চাপা দিল, বা আগুন লেগে অনেক কিছু পুড়ে গেল। মানুষ সেদিন এর কারণ কিছু ধরতে পারত না। পাথর কেন পড়ে, আগুন কেন লাগে — এসব কোন ধারণাই সেদিন মানুষের ছিল না। আজ মানুষ জানে যে, এই পাথরের শক্তি হচ্ছে ভৌত শক্তি (physical force) — এটা বস্তুনিরপেক্ষ কোন শক্তি নয়।

কিন্তু সেদিন মানুষের সামনে এগুলো ছিল অনিষ্টকর শক্তি। তাই আদিম মানুষ এই সমস্ত শক্তিকে বশীভূত করার, তুষ্ট করার চেষ্টা করত। তারা মনে করত, এইসব শক্তিকে তুষ্ট করতে না পারলে সেগুলো মানুষের অনিষ্ট করতে পারে। সুতরাং আদিম মানুষ পাথরের সামনে, আগুনের সামনে নাচত, নানারকমের অঙ্গভঙ্গি করত। তারা মনে করত, হয়ত এর দ্বারা এই অনিষ্টকর শক্তিগুলো তুষ্ট হবে। কিন্তু লক্ষ করা দরকার, বস্তুবহির্ভূত কোন সত্তার অস্তিত্বের কথা সেদিন মানুষ ভাবেনি। যেসব শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য এ সমস্ত কাজ আদিম মানুষ করত, মন্ত্র উচ্চারণ করত, সেই সবকিছুরই গোড়া ছিল বস্তু। এসব করা ছাড়া মানুষের হাতে সেদিন অন্য কোন উপায় ছিল না। এর বাইরে কিছু করবার মত চিন্তাশক্তিও সেদিন আদিম মানুষের ছিল না। সেদিন বস্তুর চরিত্র তারা জানতে পারুক আর নাই পারুক, বস্তুকে জানবার প্রচেষ্টা তাদের ছিল। অর্থাৎ, আদিম মানুষের এই উপায়ের মধ্যেই রয়ে গেছে বস্তুকে জানবার প্রচেষ্টা। অথচ, পরবর্তীকালে মানুষ এই মন্ত্রতন্ত্রকে দেবদেবীর উপাসনার উপায় করে ফেলেছে। কী অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করুন। যে মন্ত্রতন্ত্র (magic) আদিমযুগে বস্তুকে জানবার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার দ্বারা আদিম মানুষ বস্তুকে জানতে পারুক আর নাই পারুক, সেই মন্ত্রতন্ত্র পরবর্তীকালে একেবারে ভিন্ন চরিত্র অর্জন করেছে — পূজা-আর্চা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এমনকী বিজ্ঞানের এত উন্নতির পর, এমনকী পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের পর, মন্ত্রতন্ত্র আজও সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় আচরণের সাথে যুক্ত হয়ে আছে।

তাহলে আপনারা দেখতে পেলেন যে, আদিম মানুষের চিন্তা ছিল বস্তুতান্ত্রিক, বস্তুবহির্ভূত কোন সত্তার চিন্তা আদিম মানুষ করেনি। যদিও বস্তুর রূপ ও চরিত্র সম্পর্কে তার সঠিক কোন ধারণাই ছিল না। আজ বস্তু সম্পর্কে আমরা যা জানতে পেরেছি, যা দেখছি, বুঝছি — তার কোন কিছুই সেদিন মানুষ জানতে পারেনি, জানা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু বস্তুকে জানবার জন্যই বস্তুর সঙ্গে সে লড়াই করেছে এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করেই তাকে এগোতে হয়েছে। 'সৃষ্টিকর্তা ভগবান' বা বস্তুনিরপেক্ষ কোন সত্তার কথা চিন্তা করা আদিম মানুষের

পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঈশ্বরচিন্তার কোন ছাপ আদিম মানুষের মনে সেদিন স্থান পায়নি। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা এসেছে অনেক পরে। ঈশ্বরচিন্তা সমাজে এমন এক সময়ে এসেছে যখন ঈশ্বরচিন্তা মানুষের মনে আসবার মতো অনুকূল পরিবেশ বা পরিস্থিতি সমাজে সৃষ্টি হয়েছে, তার আগে নয়। তাই একদিকে বস্তুনিরপেক্ষ সত্তার ধারণা মনে আসবার মতো অনুকূল পরিবেশ, অপরদিকে মানুষের চিন্তা ও কল্পনা করার ক্ষমতা — ওই দু'য়ের সম্মিলনেই মানুষের মনে ভগবৎ চিন্তার প্রথম আবির্ভাব।

ঈশ্বরচিন্তা গড়ে ওঠার কারণ

মানুষের মধ্যে এই ঈশ্বরচিন্তা এসেছে কেন? মানুষের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তার আবির্ভাব ঘটেছে এমন একটা সময়ে যখন সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে, মানুষ যখন স্থায়ী সম্পত্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, সমাজে যখন শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। মানুষ যখন দেখেছে যে, যিনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন তাঁর ইচ্ছায় যে আইন তৈরি হয়, সেই আইন সকলকেই মেনে চলতে হয় এবং সেই কারণে সমাজও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পরিচালিত হয় — এরকম একটি সময়ে এসে একটা চিন্তা মানুষের মগজে ধাক্কা দিয়েছে। মানুষ লক্ষ করেছে, এই যে বিশ্বচরাচর, এই যে দুনিয়া সে একটা নিয়ম মেনে চলছে। দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হচ্ছে। ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে — শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা নিয়ম মেনে ঘুরে ফিরে আসছে। জোয়ার-ভাটা হচ্ছে, অমাবস্যা-পূর্ণিমা হচ্ছে। সমস্ত কিছু নিয়ম মেনে ঘটছে। মানুষ ভেবেছে, একজন শাসক না থাকলে, একজন আইনপ্রণেতা না থাকলে, একজন প্রভু বা 'মাস্টার' না থাকলে সমাজই যেখানে নিয়ম মেনে চলতে পারে না সেখানে এই যে বিশ্বচরাচর ও দুনিয়া নিয়ম মেনে চলছে, নিশ্চয়ই এর পিছনেও একজন প্রভু বা মাস্টার আছে। অর্থাৎ, সমাজের শৃঙ্খলার পেছনে শাসনকর্তার যে ভূমিকা বর্তমান, তাকে লক্ষ করে প্রকৃতি ও বিশ্বচরাচরের নিয়ম মেনে চলার কারণকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই দু'টি ঘটনার মধ্যে যে সাদৃশ্য তাদের মনে ধাক্কা দিয়েছে তাকে ভিত্তি করেই তারা দুনিয়ার একজন প্রভু বা 'সুপার মাস্টার' আছে — এইভাবেই ভগবানকে খুঁজে পেয়েছে। এটাই হচ্ছে দুনিয়ায় ভগবৎ চিন্তার জন্মের মূল কারণ। এই পথ বেয়েই ভগবৎ চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে সমাজে।

তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার। প্রকৃতির সুশৃঙ্খল এই পরিবর্তনগুলোকে লক্ষ করে মানুষের মনে শুরুতেই এইসব প্রশ্নের উদয় হয়নি। সমাজের শৃঙ্খলার সাথে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলাকে বা সমাজের প্রভুর সাথে দুনিয়ার 'সর্বশক্তিমান' ভগবানের অস্তিত্বের কথা মানুষ শুরুতে ভাবতে পারেনি। ততদিন ভাবতে পারেনি যতদিন সমাজে কোন নিয়মশৃঙ্খলা কাজ করেনি, কাজ করেছে জঙ্গলের রাজত্ব। মানুষ যখন অনেকটা পশুর স্তরে ছিল, অর্থাৎ, মানুষ যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, কোন নিয়মশৃঙ্খলার প্রশ্নই যখন সমাজে গড়ে ওঠেনি সেই সময় কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কে ঈশ্বর ধারণার জন্ম হয়নি, যদিও প্রকৃতির সুশৃঙ্খল পরিবর্তনকে তারা আগের থেকেই লক্ষ করেছে। ঠিক কোন্ সময়ে এসে সমাজে ঈশ্বর ধারণার সৃষ্টি হল, সেই সময়ে বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থাটা কী ছিল, সেসব বিশদ গবেষণার বিষয়। এসব বিষয় নিয়ে অনেক নৃতাত্ত্বিক (anthropological) গবেষণা হয়েছে। মর্গান থেকে শুরু করে অনেকেই এ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। এইসব গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এবং বিভিন্ন 'কেভ পেন্টিং' (আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্র) বা অন্যান্য মেটিরিয়াল থেকে যতটা জানতে পারা গেছে, তা থেকে আমার যেটা মনে হয়েছে, তাহ'ল, প্রথম ঈশ্বরচিন্তা মানুষের মনে ধাক্কা দিয়েছে দাস-প্রভুতে বিভক্ত সমাজব্যবস্থায়। যাই হোক, আপনারা লক্ষ করেছেন যে, বস্তু বা বস্তুর শক্তিকে জানবার উপায় হিসেবে মানুষ যখন মন্ত্রতন্ত্রের (magic-এর) চর্চা করেছে তখনও সমাজে ভাববাদ বা ঈশ্বরবাদের জন্ম হয়নি। কী কারণে, কোন্ পরিস্থিতিতে মানুষের মনে সর্বশক্তিমান ভগবানের ধারণা জন্ম নেয় সে সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আমি আপনাদের কাছে এখানে রেখেছি। পরবর্তীকালে বস্তুর দ্বারা গঠিত গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে বস্তুনিরপেক্ষ শক্তি হিসেবেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াতেই চন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এইসব গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রকে বস্তুনিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার এইসব 'অতিপ্রাকৃত' শক্তির ব্যাখ্যা সমস্ত ধর্মে একইভাবে করা হয়নি। মুসলমানদের কোরান, খ্রিস্টানদের বাইবেল এবং হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা এক নয়। শুধু একটি জায়গায় এক যে, সকল ধর্মেই বস্তুনিরপেক্ষ এবং অতিপ্রাকৃত মহাশক্তির কল্পনা করা হয়েছে — যে অতিপ্রাকৃত মহাশক্তিই সব কিছুর আধার এবং মূল বলে ভাবা হয়েছে এবং তাঁর ইচ্ছায় দুনিয়াতে সবকিছু

ঘটে চলেছে বলে বলা হয়েছে। সকল ধর্মই বলেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বাধীন ইচ্ছা, তা বস্তুর নিয়মের ঊর্ধ্বে। বলেছে, গোটা বস্তুজগৎ এবং তার নিয়ম-কানুন ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ। একসময়ে ঈশ্বরকে নিরাকার হিসেবেই কল্পনা করা হয়েছে — বলা হয়েছে, তাঁর কোন আকার নেই। ঈশ্বরের গুণাগুণ সমস্ত ধর্মেই অনেক অনেক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এই ঈশ্বর কে, তিনি কোথায় থাকেন — এসব হদিশ কেউ কোনদিন পাননি। ঈশ্বর সম্পর্কে এসব জানবার কোন উপায় নেই, যেহেতু তিনি কোথাও থাকেন না। মানুষের মস্তিষ্ক ছাড়া কোথাও ঈশ্বর বিরাজ করেন না। ঈশ্বর আছেন মানুষের কল্পনায়, আমাদের 'ইমাজিনেশন'-এ। তিনি শুধু বিরাজ করেন মনের আয়নায়। মনের আয়নায় ঈশ্বর কীভাবে ঢুকেছেন সে ইতিহাস আপনারা আগেই শুনেছেন। আবার হিন্দুধর্মে আমরা তেত্রিশ কোটি দেবতার উল্লেখ দেখতে পেয়েছি একটি সময়ে। বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সংক্রান্ত ব্যাখ্যাগুলো বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। যদিও সব ধর্মের মূল কথাটা যে এক, সেটা আপনারা আগেই শুনেছেন।

সুতরাং আপনারা দেখতে পেলেন যে, আদিম মানুষের চিন্তা বস্তুতান্ত্রিক হলেও মানব সমাজের অগ্রগতির একটা বিশেষ স্তরে এসে সমাজে ভাববাদী চিন্তার জন্ম হয়েছে। এই ভাববাদী চিন্তা আসার পর থেকে সমাজে ভাববাদ ও বস্তুবাদী চিন্তা পাশাপাশি চলছে, একে অপরের সাথে টক্কর লড়ছে। সুতরাং মানবসমাজের চিন্তাধারাকে যদি ভাগ করা যায়, তাহলে মূলত তাকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি — একটা ভাববাদী চিন্তাধারা, আর একটা বস্তুবাদী চিন্তাধারা। এই ভাববাদী চিন্তার মধ্যেও বহু ভাগ আছে, তাদের নিজেদের পরস্পরের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব আছে, আবার এক জায়গায় তাদের মূলগত ঐক্য আছে। আবার একথাটাও মনে রাখা দরকার যে, ভাববাদ মানেই সবসময় ঈশ্বরবাদ নয়। এমন অনেক ভাববাদী আছেন যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, যাঁরা নিরীশ্বরবাদী। তাঁরা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করতে চান। কিন্তু, তা সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তা সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক থাকতে পারেনি। তাঁরা ঈশ্বর বিশ্বাস না করলেও ভাববাদী চিন্তার শিকার হয়েছেন, ভাববাদেরই চর্চা করেছেন। তাঁদের সেই ভাববাদী চিন্তার প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা যেমন আছে, তেমনই তাঁরা সকলেই কোন না কোন প্রশ্নে বস্তুবহির্ভূত একটা সত্তায় বিশ্বাস করেছেন। এই বিশ্বাসকে তাঁরা সকলেই মনমাফিক (subjectively) ধরে নিয়েছেন, অর্থাৎ, বস্তুজগতের বাইরে, বস্তুর নিয়মের বাইরে নির্বস্তু একটা সত্তার অস্তিত্ব যেভাবেই হোক্ তাঁরা ধরে নিয়েছেন। তাঁরা সকলেই একটা জায়গায় একমত থেকেছেন, তা হচ্ছে বস্তুজগতটাই শুধু সত্য তা নয় — দুনিয়াতে বস্তুবহির্ভূত একটা সত্তার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এই বস্তুবহির্ভূত সত্তা কীভাবে আছে সেখানেই তাঁদের মতভেদ। এই যে বিশেষ চিন্তার ধারা বা চিন্তাপদ্ধতি তাকেই আমরা বলি ভাববাদী চিন্তাপদ্ধতি (idealist process of thinking)। অন্যদিকে, দ্বিতীয় আর একটি যে চিন্তাধারা, অর্থাৎ, বস্তুবাদী চিন্তাধারা — সেই চিন্তাধারার মূল কথা হচ্ছে, বস্তুই সমস্ত চিন্তার আধার। এই চিন্তাধারার প্রবক্তারা মনে করেন, বস্তুজগতই সত্য — বস্তুনিরপেক্ষ সত্তার কোন অস্তিত্ব নেই এই দুনিয়াতে। এই বিশেষ ধরনের চিন্তাধারাকে আমরা বলি বস্তুবাদী চিন্তাধারা। এই বস্তুবাদী চিন্তার ভিত্তিতে দুনিয়াতে বহু বস্তুবাদী দর্শন গড়ে উঠেছে। কারণ, বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও বস্তু সম্বন্ধে তাঁদের সকলের ব্যাখ্যা এক নয়, ধারণাও এক নয়।

ভাববাদ ও বস্তুবাদ

বিভিন্ন ভাববাদী বা বস্তুবাদী দর্শনগুলির প্রত্যেকের নিজেদের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান সেই আলোচনায় আমি এখানে যাব না। শুধু এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক একটি কথা বলে যেতে চাই, তা হচ্ছে, মানবসমাজের বিকাশের সাথে সাথে, সভ্যতা ও চিন্তাজগতের বিকাশের সাথে সাথে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-অভিজ্ঞতার বিকাশের সাথে সাথে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দুটো চিন্তাধারাই ক্রমাগত পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ হয়ে আজ একটা বিশেষ জায়গায় এসে পৌঁছেছে। দুনিয়ার ইতিহাসে ঈশ্বরচিন্তা আসবার পরেও সেই চিন্তা এক জায়গায় বসে থাকতে পারেনি। নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সাথে তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। যেমন, কোনও কোনও ধর্মে ভাবা হয়েছে যে, man is born good। অর্থাৎ, মানুষ মূলগতভাবে ভালো গুণ নিয়েই জন্মেছে। অথচ, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সমাজে শুধু ভালো মানুষ আছে তাই নয়, মন্দ মানুষও আছে। সুতরাং, আমাদের বলতে হবে, ঈশ্বর শুধু ভালো বা খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, মন্দ বা খারাপ মানুষও তৈরি করেছেন। একথা বললে অনেকে একটু বিপদগ্রস্ত বোধ করেন। আর যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ঈশ্বর শুধু ভালো মানুষই সৃষ্টি করেছেন, তাহলে সৃষ্টির আদিতেই ভগবান ও শয়তান দু'জনকেই ধরতে হবে ভালো ও মন্দ এই দুই ধরনের মানুষ সৃষ্টির জন্য।

এভাবে ধরলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, দুনিয়া শুধু ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, শয়তানেরও সৃষ্টি। এইসব কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেদিন মানুষকে। এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে কেউ কেউ ঈশ্বরতত্ত্বই ছেড়ে দিলেন, 'অ্যাগ্‌নস্টিক' (অজ্ঞেয়বাদী) হয়ে পড়লেন। এই অ্যাগনস্টিকদের বক্তব্য হচ্ছে, ঈশ্বর আছেন কি নেই সেটা মানুষের জানার অতীত। অর্থাৎ, তাঁদের ভাবখানা এইরকম যে, এটা মানুষের বিচার্য বিষয় নয়।

এখানে কথা প্রসঙ্গে আমি একটি অভিজ্ঞতার কথা বলে যাই। এমন কিছু মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যাঁরা 'এথিস্ট', যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু, তাঁরা মার্কসবাদী বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নন, তাঁরা মানবতাবাদী, 'হিউম্যানিস্ট'। তাঁদের চিন্তাভাবনার ধরনটা হচ্ছে, ভগবতবিশ্বাসই সমস্ত রকম অনিষ্টের মূল। তাঁরা মনে করেন, শোষণ ও সবরকম অনিষ্টের গোড়ার কথা হচ্ছে ভগবত বিশ্বাস। তাঁদের ধারণা, শ্রেণীসংগ্রাম, মার্কসবাদ এসবের কোনও ভিত্তি নেই, প্রয়োজনও নেই! তাঁদের বক্তব্য হ'ল, ভগবানের চিন্তাকে মন থেকে তাড়াতে না পারলে মানুষের মুক্তি নেই। তাঁরা বলেন, মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, নাহলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সে লড়াই করতে পারবে না। তাঁরা মনে করেন, মানুষ যে অপরের জুলুম বা জবরদস্তি সহ্য করে, চুপ করে মার খায় — এসব কিছু হল অদৃষ্টবাদ বা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের জন্য। তাই তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, ঈশ্বরবিশ্বাস দূর করতে হবে, তাহলেই মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াবে। এই হচ্ছে তাঁদের যুক্তির ধারা বা যুক্তির কাঠামো। কিন্তু আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, এই সমস্ত নিরীশ্বরবাদীদের সাথে মার্কসবাদীদের কোন মিল নেই। মার্কসবাদীরাও নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু নিরীশ্বরবাদ মাত্রই মার্কসবাদ নয়। এমন বহু নিরীশ্বরবাদী আছেন যাঁরা মার্কসবাদবিরোধী। ইতিহাসে এমন ঘটনা দেখা যাবে যে, ঈশ্বরবাদীদের সাথে বরং মার্কসবাদীরা সমাজপ্রগতির সংগ্রামে একসঙ্গে অনেক দূর এগিয়েছে, কাজ করেছে মানবসভ্যতার বিকাশের জন্য। কিন্তু এধরনের নিরীশ্বরবাদীদের সাথে মার্কসবাদীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করতে পারেনি। একথাটা আপনারা মনে রাখবেন।

যাই হোক্, আমাদের আগের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। স্থায়ী সম্পত্তি সৃষ্টির পরে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যখন ভগবতচিন্তার জন্ম হ'ল, মানুষের চিন্তায় সর্বশক্তিমান ভগবান বা 'অলমাইটি গড্'-এর ধারণা এসে গেল, সেরকম একটি অবস্থায় মানুষ রাজা-রাজড়াদের ভাবত তাঁরাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মানুষ মনে করত, ঈশ্বর যেমন বিশ্বকে চালান, তেমনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে রাজাও দেশ ও সমাজকে চালাচ্ছেন, সকলকে শাসন করছেন। সুতরাং সে সময়ে মানুষের বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বরকে মানলে রাজাকেও মানতে হবে, রাজার প্রতি 'লয়াল' হতে হবে। অর্থাৎ, মানুষ মনে করত, ঈশ্বরের বিরোধিতা যে করতে চাইবে না, সে রাজার বিরুদ্ধেও যাবে না। উল্টো দিক থেকে বললে, মানুষের ধারণা ছিল, যে রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, সে ঈশ্বরের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ধর্মের ব্যাপারটা সেদিন এরকমই দাঁড়িয়ে গেল। সেজন্য ধার্মিকরা সেদিন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'রিভোল্ট' বা বিদ্রোহ করেনি। ফলে, ঈশ্বর বিশ্বাস সেদিন রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্যই করেছে।

কিন্তু যাঁরা বলেন যে, ইতিহাসের সমস্ত স্তরে ভাববাদী দর্শন শোষকশ্রেণীর হাতে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। আমার মতে, এই ধারণা ইতিহাসের বিকৃতি, বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ নয়। আবার একইভাবে যাঁরা বলেন যে, বস্তুবাদী চিন্তা সবসময়েই সমাজে শোষিতশ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁদের সেই চিন্তাও আমি মনে করি ভ্রান্ত। এইসব চিন্তার সাথে কোনদিন আমি একমত হতে পারিনি। কেন পারিনি সে সম্পর্কে দু'চার কথা বলব।

ইতিহাসে ভাববাদ ও বস্তুবাদের ভূমিকা

যেমন, দাস ও দাসপ্রভুতে বিভক্ত সমাজ, অর্থাৎ, 'স্লেভ-স্লেভ মাস্টার্স সোসাইটি'-র কথা ধরা যাক। আপনারা সকলেই দাসদের ওপর দাসপ্রভুদের নির্মম অত্যাচারের বহু কাহিনী শুনেছেন। এসব বিষয় নিয়ে অনেক গল্প-গাথা লেখা আছে, যে অত্যাচারের বিবরণ ও করুণ কাহিনী আজও মানুষের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এইসব ঘটনা খুবই মর্ম্মন্তুদ। কিন্তু যাঁরা খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী, তাঁদের মধ্যে দাসদের ওপর দাসপ্রভুদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। যিশুখ্রিস্টের শিক্ষা অনুযায়ী বা খ্রিস্টধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী তাঁরা সকলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ভগবানের সৃষ্ট সকল মানুষই সমান। তাঁরা মনে করতেন, ভগবানের সৃষ্ট জীবদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। খ্রিস্টধর্মের এই যে বদ্ধমূল

অনুশাসন তাঁদের মনের মধ্যে গেঁথে ছিল সেই ধারণাকে পাথেয় করেই দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে দাসরা সংঘবদ্ধ হয়েছে, প্রতিবাদ করেছে। খ্রিস্টধর্মের শিক্ষার ভিত্তিতে তারা এই যুক্তি উত্থাপন করতে শুরু করে যে, দাসপ্রভুরা দাসদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে আসলে খ্রিস্টধর্মের অনুশাসনেরই বিরুদ্ধাচরণ করছেন। তারা বলতে থাকে যে, দাসদের অত্যাচার করা হল খ্রিস্টধর্মের অবমাননা করা। সুতরাং একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এদিক থেকে বিচার করলে খ্রিস্টধর্ম দাসপ্রভুদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এবং সেই অর্থেই একসময় সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে। মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও এ ধরনের নজির পাওয়া যায়।

আর একটি দিক থেকেও বিষয়টিকে ভেবে দেখা দরকার। আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, সমাজবিকাশের একটা স্তরে এসে ধর্মই মানুষের মধ্যে নীতিনৈতিকতার ধারণা, মূল্যবোধ, সেবার মনোবৃত্তি, অপরকে হেয় না করা, ন্যায়-অন্যায়বোধের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এরই ফলে সমাজে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠেছে এবং তা সমাজকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে এবং সেইদিক থেকেও ধর্ম সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে, ইতিহাসে ধর্ম যে স্তরে যতটুকু সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে, সমাজ-অগ্রগতির ক্ষেত্রে ততটুকুই তার ঐতিহাসিক মূল্য। একে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, ইতিহাসকে অস্বীকার করা। ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলো ঠিক কি ঠিক নয়, এসব জ্ঞানতত্ত্বের ভিন্ন আলোচনার বিষয়। এখানে আমার কথা হচ্ছে, ভাববাদী চিন্তা ইতিহাসে বেশিরভাগ সময় শোষকশ্রেণীর শোষণের হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করেছে একথা ঠিক, কিন্তু তাই বলে ধর্মীয় চিন্তা বা ভাববাদী চিন্তাধারা সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন সময়ে কোন ভূমিকা পালন করেনি, একথা আমি কোনদিন মেনে নিতে পারিনি।

আবার, যাঁরা মনে করেন যে, বস্তুবাদী চিন্তা মানেই তা সবসময় শোষিতশ্রেণীর সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে — সে চিন্তাও আমার মতে পুরোপুরি সত্য নয়। একথা আপনারা সকলেই জানেন যে, একটা সময় এসে যে রাজা-রাজড়ারা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে জাহির করেছে সেই রাজা-রাজড়ারাই পরবর্তীকালে পরকালের কথা না ভেবে জীবনে বিলাস-ব্যসনের চর্চা করেছে, মোটা অর্থে জীবনকে ভোগ করাকেই জীবনের মোক্ষ হিসেবে ধরে নিয়েছে। এর দ্বারা আসলে 'ভাল্‌গার মেটেরিয়ালিজম'-এরই চর্চা তারা করেছে। তখন তাদের মধ্যে বাস্তবে ধর্মীয় অনুশাসন বা ধর্মের ভিত্তিতে ন্যায়-অন্যায়বোধের চিন্তা কাজ করেনি। পাপ-পুণ্যের কথা ভুলে গিয়ে জীবনকে কীভাবে ভোগ করা যায় এই চিন্তাই সেদিন তারা করেছে এবং এইভাবে মানুষকে স্বার্থপর হতে এবং এরদ্বারা সমাজের অগ্রগতিকে বাস্তবে ব্যাহত করতেই তারা সাহায্য করেছে।

আবার দেখুন, আপনারা সকলেই জানেন যে, চার্বাকের দর্শন বস্তুবাদী দর্শন। এই চার্বাক-দর্শনের বিশদ আলোচনায় আমি এখানে যাচ্ছি না। আমি এখানে যেটা দেখাতে চাইছি, তা হচ্ছে, এই দর্শনে জীবনের ভোগটাই সত্য একথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। চার্বাকের নামে যে কথাটা মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত হয়ে আছে, সেটা হচ্ছে, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"। চার্বাক যে অর্থেই কথাটা বলে থাকুন না কেন, অনেকেই এই বক্তব্যের সুযোগ নিতে ছাড়েননি। চার্বাকের এই বক্তব্যের অর্থ অনেকে এরকম দাঁড় করিয়েছেন যে, "নিজে খেয়ে পরে থাক, অপরে মরল কি বাঁচল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।" বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এহেন বস্তুবাদী চিন্তা বাস্তবে সামাজিক স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে এবং এর দ্বারা আসলে সুবিধাবাদী চিন্তার জন্ম দিতে সাহায্য করেছে ও সমাজের অগ্রগতিকে কার্যত ব্যাহত করতে সাহায্য করেছে।

পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক

যাই হোক, আবার আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক। সমাজ বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের কথা যাঁরা জানেন তাঁরা কেউই একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য, আরও উন্নততর জীবনযাপনের প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রক্রিয়ায় একটা স্তরে এসে উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে, সমাজে কিছু না কিছু উৎপাদন করার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে। মানুষের যে চেতনা বা সচেতন ক্রিয়া সেটা বিভিন্ন অবস্থায় প্রকৃতিকে জানবার সংগ্রামে এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনে যুক্ত হয়েছে। একথার অর্থ হ'ল, একদিকে মানুষের মস্তিষ্ক, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে গড়ে-

ওঠা সামাজিক বা বাস্তব পরিবেশ এবং বহির্বিশ্বের সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই মানুষের চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটতে থাকে। আপনারা মনে রাখবেন, এখানে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক বলতে সবকিছুকেই বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ, মানুষের চারপাশে যা কিছু পড়ে — বস্তুজগৎ, সমাজজীবন, বহির্বিশ্ব বা প্রকৃতিজগৎ এই সবকিছু নিয়েই এই পরিবেশ কথাটাকে আপনাদের বুঝতে হবে। জীবনধারণ করতে গিয়ে যেসব জিনিসের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে — পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক বলতে তার সবকিছুকেই ধরতে হবে। মানুষ একটা বিশেষ সত্তা (entity) হিসেবে, দ্বন্দ্বের একটি শর্ত (condition) বা বিষয় হিসেবে, অর্থাৎ, 'পয়েন্ট অফ কন্ট্রাডিকশন' হিসেবে এই পরিবেশের সাথে যুক্ত হচ্ছে। সুতরাং পরিবেশের বাইরে যেমন মানুষের বিচার করা যায় না, ঠিক তেমনই পরিবেশও প্রতিনিয়ত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে মানুষের ওপর এবং এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের পরিণতিতেই গড়ে উঠেছে মানুষের চিন্তা।

এখানে আর একটা কথাও আপনাদের বোঝা দরকার। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে, আদিম যুগে যখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গড়ে ওঠেনি তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজ-অগ্রগতি বা প্রগতির ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অবস্থায় সমাজপ্রগতি স্তব্ধ হয়ে থাকেনি। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, তা হচ্ছে, দ্বন্দ্ব-সমন্বয়-সংঘাত ছাড়া যেখানে কোন গতির সৃষ্টি হতে পারে না, সেখানে সেই আদিম সমাজে যেখানে শ্রেণীবিভক্তি বা শ্রেণীসংগ্রাম ছিল না, সেখানে কোন্ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে? একথা বুঝতে হবে যে, সেই আদিম সমাজে মানুষের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে যতটুকু পরিবেশ অবস্থান করত সেই পারিপার্শ্বিক বা প্রকৃতির সাথে মানুষের মস্তিষ্কের সংঘাতই ছিল সেদিনকার সমাজের মূল দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে সেদিনকার সমাজ এগিয়েছে। তাই সবসময়ই পরিবেশ বলতে একটা বিশেষ সময়ের পরিবেশকে বুঝতে হবে এবং তা বুঝতে হবে ব্যাপক অর্থে এবং সবকিছুকে 'ইনক্লুড' করে। আর, এই যে বাস্তব পরিবেশ বা পরিস্থিতি তাকেই বলা হয় 'অবজেকটিভ' বা 'মেটেরিয়াল কন্ডিশন'। আবার মনে রাখতে হবে, বাস্তব পরিস্থিতি পাল্টালে সেটাও মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কেননা পরিবর্তিত পরিস্থিতি মানুষের সাথে পারিপার্শ্বিকের নতুন সংঘাতের জন্ম দেয় এবং সেই নতুন সংঘাতের প্রক্রিয়ায় নতুন চিন্তার জন্ম হয়। কিন্তু এখানে একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার, তা হচ্ছে, বাস্তব পরিবেশ ও মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে সংঘাতহয় এবং সেই সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে নতুন চিন্তার জন্ম হয় সেটা পরিবেশ পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে বা 'অটোমেটিক্যালি' হয় না। পরিবেশ পাল্টাবার পরেও নতুন চিন্তার সূচনা ঘটতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। যাঁরা মনে করেন, পরিস্থিতির যেমন যেমন পরিবর্তন ঘটবে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা আপন নিয়মে, অটোমেটিক্যালি পরিবর্তিত হবে তাঁদের চিন্তা যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট। তাছাড়া, আর একটা কথাও আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, ভাবজগৎ গড়ে ওঠার মূল বা ভিত্তি হচ্ছে বস্তুজগৎ। বস্তুজগতের অস্তিত্ব ছাড়া ভাবজগতের অস্তিত্বকে কল্পনা করা যায় না। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, মানুষের মস্তিষ্কের উন্নত গঠন ও তার চিন্তা করার ক্ষমতার সাথে বাস্তব জগতের সংঘাতের মধ্য দিয়েই ভাব বা চিন্তার জন্ম হয়েছে। সুতরাং মানুষের যে চিন্তা করার শক্তি, তার বেস বা ভিত্তি হল মস্তিষ্ক। আবার, চিন্তা বা ভাব যখন এসে গেল, তখন থেকেই পরিবেশের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। মানুষ তখন যে শুধু বস্তুজগৎ বা সমাজকে প্রভাবিত করছে তাই নয়, বাস্তব পরিবেশও মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা, যেকোন চিন্তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতাকেও (adaptability) বাড়াতে সাহায্য করছে। এর ফলে এমনকী মানুষের মস্তিষ্কের গঠন আরও উন্নত হচ্ছে, 'কমপ্লেক্স' হচ্ছে। এখানে কমপ্লেক্স কথাটাকে উন্নত অর্থে বুঝতে হবে। অর্থাৎ, যে উন্নত মস্তিষ্ক ক্রমাগত উন্নত চিন্তাকে জন্ম দিতে ও তাকে পুরোপুরি গ্রহণ (assimilate) করতে পারে। তাই বলছি, বস্তু যেমন চিন্তার জন্ম দিচ্ছে, আবার চিন্তাও বাস্তবকে প্রভাবিত করছে। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে।

কিন্তু একথা সবসময়ে মনে রাখতে হবে যে, বস্তুই হচ্ছে চিন্তার স্রষ্টা — বস্তুই 'প্রায়র্'। মানুষ যে মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তা করে সেই মস্তিষ্ক বস্তুর দ্বারা গঠিত। আবার, যে পরিবেশ বা বাস্তবের সাথে মানুষের মগজের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলশ্রুতিতে চিন্তা জন্ম নিচ্ছে সেই পরিবেশও বস্তুরই সমাহার। তাই পরিবেশের মধ্যেই মানুষের চিন্তা বা ভাবের বিকাশ হয়, আবার চিন্তা বা ভাব পরিবেশকে পাল্টাতে সাহায্য করে। মানুষ প্রতিকূল পরিবেশের সামনে অসহায় নয়। পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবের বিকাশ সম্ভব নয়। আবার, এ

কথার অর্থ যদি এই দাঁড়ায় যে, ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে কেউ যুক্তি করতে শুরু করলেন, "তিনি কী করবেন, তিনি অসহায়, পরিবেশই তাঁকে এমন জায়গায় ঠেলে দিয়েছে, তাঁর কিছু করার নেই" — তাহলে সেই চিন্তাও সঠিক চিন্তা নয়। যথার্থ বস্তুবাদী চিন্তা তো নয়ই। এ ধরনের চিন্তার মধ্যে ব্যক্তির ভূমিকাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হ'ল। কেননা, চিন্তা যখন এসে গেল তখন তারও যে আবার নিজস্ব একটা ভূমিকা আছে, চিন্তারও যে একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা বা 'রিলেটিভ ইন্ডিপেন্ডেন্স' আছে, পরিবেশের ওপর সেও যে ক্রিয়া করে — এহেন চিন্তার দ্বারা তাকেই অস্বীকার করা হল।

চিন্তার আপেক্ষিক স্বাধীনতা — চরম স্বাধীনতা নয়

তাহলে চিন্তা যখন এসে গেল, সে আপেক্ষিক স্বাধীনতা নিয়েই এলো — এ কথাটা মনে রাখতে হবে। আবার, ভাব বা চিন্তার আপেক্ষিক স্বাধীনতা আছে, একথার মানে যদি কেউ এরকম মনে করেন যে, চিন্তা হ'ল পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বাধীন সত্তা, তাহলে সেটাও হবে ভুল। মনে রাখতে হবে যে, পরিবেশের সাথে চিন্তা বা ভাবের সম্পর্ক হ'ল দ্বান্দ্বিক বা 'ডায়ালেক্‌টিক্যাল'। সেই কারণেই আবার চিন্তার যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে সেটা রিলেটিভ বা আপেক্ষিক, তা অ্যাবসলিউট বা চরম স্বাধীনতা নয়। স্থান-কাল-পরিবেশ বহির্ভূত সত্তা হিসাবে চিন্তা বিরাজ করে না। আবার, একটু আগেই আপনারা আলোচনায় শুনেছেন যে, পরিবেশ বা বাস্তব অবস্থা যেমন যেমন পাল্টাচ্ছে, ভাব বা চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে তেমন তেমন করেই পাল্টাবে — এ ধরনের চিন্তাও যান্ত্রিক এবং অবৈজ্ঞানিক। পরিবেশই যদি একান্তভাবে সমস্ত ভাবনাচিন্তার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে, পরিবেশকে প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাশক্তির যদি কোন ভূমিকা না থাকে, তাহলে আমাদের অদৃষ্টবাদের পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সেক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা নিষ্ক্রিয়, নির্জীব, নিশ্চল ও নিষ্ফলা হয়ে পড়ে। এই ধরনের চিন্তা বিপ্লবী সংগঠন ও বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতিসাধন করতে বাধ্য। এই চিন্তার শিকার হলে, যে বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টি গড়ে উঠেছে সেই পার্টিটাই গড়ে তোলা সম্ভব হত না। তাছাড়া পরিবেশের ভূমিকাকে এমন একান্ত করে ধরে নিলে যে কোন কর্মসূচির ব্যর্থতার জন্য আমরা পরিবেশকেই দায়ী করব। আমরা অতি সহজে যুক্তি করব যে, প্রতিকূল পরিবেশের জন্যই আমরা ব্যর্থ হয়েছি, অর্থাৎ, আমাদের ব্যর্থতার দায়িত্ব পরিবেশের, আমাদের নয়।

অথচ ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে, মানুষই একমাত্র প্রাণী যে প্রাকৃতিক শক্তি বা প্রকৃতির কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেনি। অন্যান্য জীবজন্তুর সাথে মানুষের পার্থক্য বিরাট। অন্যান্য জীবজন্তু যেখানে পুরোপুরি প্রকৃতির দাস, সেখানে মানুষ প্রকৃতিকে জানবার চেষ্টা করে, প্রাকৃতিক নিয়মগুলোকে আয়ত্ত করে, 'হার্‌নেস' করে এবং এই প্রক্রিয়াতে সে অনিষ্টকর শক্তিকে বশীভূত করে শুভ শক্তিকে কাজে লাগায়। সুতরাং আমাদের কাজ হল, সমস্ত বাধাবিপত্তিকে জয় করা, পরাজয় স্বীকার করা নয়। কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটতে পারে যে, সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হলাম। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, হয়তো সেখানে পরিস্থিতি বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি বা গলদ ছিল। অথবা, বিষয়টা এমনও হতে পারে যে, আমাদের পদক্ষেপ সঠিক হওয়া সত্ত্বেও এবং সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন ক্ষেত্রে আমরা সফল হতে পারলাম না। এরকম হলে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, এটা ছিল আমাদের ক্ষমতার বাইরে। চেষ্টার মধ্যে যদি কোন ত্রুটি না থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে — যে চেতনা বা চরিত্রবল, যে জ্ঞান ও ক্ষমতা আমাদের থাকার দরকার ছিল সেখানে আমরা পিছিয়ে আছি। অথচ, আমরা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছি। পরিবেশকে দায়ী করে আমরা পাশ কাটাতে চাইছি। তাই বলছিলাম, পরিবেশ সংক্রান্ত এই ধারণা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ধারণা নয়।

বেস ও সুপারস্ট্রাকচার

আর একটা কথাও এখানে মনে রাখতে হবে। মার্কসবাদে আমরা যে বলি, বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে 'বেস' বা ভিত্তি, আর ভাব বা চিন্তা হচ্ছে 'সুপারস্ট্রাকচার' বা উপরকাঠামো — একথার মানে এরকম নয় যে, ভিত্তি পাল্টালে সঙ্গে সঙ্গে উপরকাঠামো পাল্টায়। যেমন ধরুন, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বেস বা ভিত্তি বলা হয়। আবার, সেই বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে যে আদর্শগত, চিন্তাগত, শিক্ষাগত, আইনসংক্রান্ত ভাবনাধারণা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সমাজে গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় উপরকাঠামো। কিন্তু খেয়াল

করলেই বুঝতে পারবেন যে, ইতিহাসের গতিপথে যখন কোন একটা পুরনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য একটা নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে, অর্থাৎ, সমাজের আমূল বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে পুরনো সমাজের উপরকাঠামোও পুরোপুরি পাল্টে যায় — বিষয়টা এমন ঘটে না। বিপ্লবের পরেও উপরকাঠামোর রেশ (hangover) দীর্ঘদিন ধরে সমাজে চলতে থাকে।

যাই হোক, যেকথা আমরা আলোচনা করছিলাম, তা হচ্ছে, ভাব এসেছে বস্তুর ক্রিয়ার ফল হিসাবে — অর্থাৎ, বস্তুই ভাবের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু ভাব আসবার পর এই দুইয়ের সম্পর্কের চরিত্র হচ্ছে একে অপরকে সাহায্য করে, অর্থাৎ, একে অপরের পরিপূরক, সাপ্লিমেন্টারি-কমপ্লিমেন্টারি। কিন্তু ভাব বা বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে শুধু এটুকু বুঝলেই চলবে না। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা প্রায়র্‌ বা মূল সেটা বুঝতে হবে — অর্থাৎ, প্রায়রিটি কনসেপশনটাও সঠিক হওয়া চাই। তাই আবার বলছি যে, বস্তু বা বাস্তব পরিস্থিতি এখানে প্রায়র্‌। কেননা, বস্তুই ভাবের জন্মদাতা। কিন্তু ভাব আসবার পর এই দুইয়ের সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক, ডায়ালেকটিক্যাল, বা সাপ্লিমেন্টারি-কমপ্লিমেন্টারি। ভাব এবং বস্তু একে অপরকে সাহায্য করে। কখনও বাস্তব পরিস্থিতি ভাবকে বেশি প্রভাবিত করে, কখনও ভাব বাস্তব পরিস্থিতির ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। যাঁরা বাস্তব পরিস্থিতির ভূমিকাকে যান্ত্রিকভাবে বোঝেন তাঁদের অনেক সময় বলতে শোনা যায় যে, সমাজ যখন এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ যখন ইতিহাস নির্দেশিত পথে একদিন আসবেই, তখন তো একদিন না একদিন আপন নিয়মেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁরা এ ব্যাপারে মার্কসবাদে যে বলা আছে সমাজতন্ত্র ইতিহাসের গতিপথে অনিবার্যভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ socialism is inevitable — তারও উল্লেখ করেন। ফলে, তাঁদের ধারণা হচ্ছে, তাহলে সেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের এত পরিশ্রম, এত ত্যাগ বা এত সংগ্রামের প্রয়োজন কী? আমি আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই যে, বিষয়টাকে এভাবে বুঝলে ভুল হবে। কেননা, সমাজতন্ত্র এই কারণেই অনিবার্য যে, পুঁজিবাদী শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও সেই চেতনার ভিত্তিতে সংগ্রামটাও অনিবার্য। 'সমাজতন্ত্র অনিবার্য' — এই তত্ত্বের এটাই হ'ল সঠিক উপলব্ধি। সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতার ধারণাটা এমন নয় যে, পুঁজিবাদী শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে চুপ করে ঘরে বসে থাকলেও সমাজতন্ত্র আপনাআপনি এসে যাবে। এভাবে বুঝলে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে বিকৃত ধারণাই গড়ে উঠবে। ফলে, এই কথাটার যথার্থ উপলব্ধি আপনাদের গড়ে তুলতে হবে। আর, এই তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি যে মুহূর্তে আপনাদের মধ্যে ঘটবে, তখনই আপনারা বিপ্লবী আন্দোলনে অনেক বেশি সক্রিয় ও সচেতন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া অন্য সমস্ত রাস্তা হল ফাঁকির রাস্তা, বা আত্মপ্রতারণার রাস্তা।

আর একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন — সেটা হল, 'নেসেসিটি' (necessity) সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণা কী? আমি মনে করি, বস্তুজগতে বা জীবজগতে যেসব পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেইসব পরিবর্তন একমাত্র তখনই ঘটে বা ঘটতে পারে যখন সেটা ঘটবার মত উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আমাদের বুঝতে হবে, প্রয়োজন না থাকলে কোন কিছু ঘটে না। মার্কসবাদে প্রয়োজনের ধারণা জগৎ ও জীবনের যথার্থ প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত — নিয়মের মধ্যে, নিয়মের পথ বেয়ে কার্যকারণ সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতে যে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে সেটাকেই আমরা যথার্থ প্রয়োজন বলি। এই যে প্রয়োজন সম্পর্কিত ধারণা — বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ নিয়মের পরিমণ্ডলে বিশেষ বিশেষ কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে যে প্রয়োজন সেই অর্থেই নেসেসিটি কথাটা ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু সমস্ত বস্তুজগতের পরিবর্তনের পেছনে একটা universal singular causal necessity কাজ করে — এভাবে বুঝলে আমরা ভাববাদের খপ্পরে পড়ে যাব। তাছাড়া, মার্কসবাদ যে প্রয়োজন বা নেসেসিটির কথা বলছে, বিজ্ঞান যে প্রয়োজনের কথা বলছে, সে প্রয়োজনবোধ প্রগতি ও সমাজকল্যাণের স্বার্থে প্রয়োজন। সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ ও অগ্রগতির মধ্য দিয়ে বিপ্লবী চেতনার ক্রমঅভিব্যক্তির পথে ব্যক্তির যথার্থ বিকাশ ও উন্নতির পরিপূরক যে প্রয়োজনবোধ, তাই হচ্ছে মার্কসবাদ ও বিজ্ঞানের অর্থে প্রয়োজনের স্বীকৃতি (recognition of necessity)।

দর্শনচিন্তার বিকাশ

এবার দর্শনের অন্যান্য কিছু কিছু দিক আপনাদের কাছে রাখবার চেষ্টা করব। আপনারা ইতিপূর্বে

শুনেছেন যে, আদিম মানুষের চিন্তা ছিল বস্তুতান্ত্রিক। সমাজে ভাববাদী চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে অনেক পরে। এই ভাববাদী চিন্তা আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে বস্তুবাদী ও ভাববাদী চিন্তা পাশাপাশি চলছে — যদিও দর্শনচিন্তার এই দুই ধারায় ভাবনাধারণার ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন ঘটেছে, যার কিছু কিছু দিক আমি আগেই বলে গেছি। এখানে মনে রাখা দরকার যে, সামন্ততান্ত্রিক ভাবনাধারণা বা কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে দুনিয়াতে যে সময় মানবতাবাদী চিন্তাধারার অগ্রগতি ঘটে, সেই সময়ে মানবতাবাদী চিন্তাধারার যাঁরা প্রবক্তা ছিলেন তাঁরা বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই এগোতে চেয়েছেন। সেটা ছিল এমন সময় যখন প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচিত হয়েছে। এই প্রকৃতিবিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়, বলা চলে, গ্যালিলিও থেকে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিউটন বহু যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, বস্তুর গতির নিয়ম (Laws of Motion) ও অন্যান্য বহু বিষয়ের ওপর নিউটনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা নতুনভাবে আলোকপাত করেছে। আবার, একথাও একইভাবে সত্য যে, ঐতিহাসিক কারণেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতাও সেদিন লক্ষ করা গেছে। যেমন, নিউটন বস্তুর গতির নিয়ম আবিষ্কার করেছেন একথা ঠিক। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, একথাও সকলের জানা আছে। কিন্তু, বস্তু কেন গতিশীল, বস্তুর গতিশীলতার কারণ কী, সেসব সেদিন জানা যায়নি। তাই নিউটনের বস্তু ছিল জড় বস্তু। এই কারণেই নিজে একজন বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও নিউটনকে 'প্রাইম মুভার' বা 'ফার্স্ট ইম্পাল্‌স'-এর কথা বলতে হয়েছে। বিষয়টাকে একটু উদাহরণ দিয়ে বললে বুঝতে সুবিধে হবে। মানুষ দেখেছে যে, ফুটবলে লাথি মারলে ফুটবল গতিতে ছোটে, বন্দুকের ট্রিগার টিপলে গুলিটা জোর গতিতে বেরিয়ে যায় বা ঘড়িতে চাবি দিলে সাতদিন ধরে ঘড়ির পেন্ডুলামটা কাজ করে — এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো সেদিন মানুষের সামনে ছিল। এই সব দেখে নিউটন ধরে নিয়েছিলেন যে, cause of motion is external, অর্থাৎ, বস্তুর গতির কারণ বস্তুর বাইরে অবস্থান করে। সেই কারণেই তিনি ভেবেছিলেন যে, প্রাইম মুভার বস্তুর মধ্যে সীমাহীন গতি দিয়ে দিয়েছে। আর এই কারণেই বস্তু গতিশীল এবং সেই গতি নিয়ম মেনে চলছে। যে নিয়মের আবিষ্কর্তা নিউটন নিজেই। এই সবের ভিত্তিতে যে 'মেকানিক্‌স' বা বলবিদ্যার ধারণা গড়ে উঠেছিল তাকেই বলা হয় 'নিউটনিয়ান মেকানিক্‌স'। এই বলবিদ্যার মূল কথাটা কী? এর মূল কথা হচ্ছে, যে কোন জিনিসকে গতিশীল করার জন্য প্রথমে একটা গতি বা ধাক্কা দেওয়া প্রয়োজন। সেদিনকার বিজ্ঞান এর বাইরে যেতে পারেনি। যদিও বস্তু কেন গতিশীল তার কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের সামনে আজ কোন অজানা বিষয় নয়।

বস্তুর চরিত্র সংক্রান্ত আর একটি বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বস্তুকে ভেঙে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা হিসেবে সেদিন পাওয়া গেছে পরমাণু বা 'অ্যাটম'। এই পরমাণুকে সেদিন ভাঙা যায়নি। সেটা এইজন্য যায়নি যে, পরমাণুকে ভাঙবার চিন্তা গড়ে ওঠেনি এবং ভাঙবার মত উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সেদিন আবিষ্কৃত হয়নি। এই কারণে বহুদিন পর্যন্ত অ্যাটম বা পরমাণুকে মনে করা হয়েছে 'ইনডিভিজিব্‌ল্'। সেই যুগে ভাববাদী দার্শনিকেরা অ্যাটমকে প্রায় ব্রহ্মার আসনে বসিয়েছিলেন। পরে এই ভুল ধারণা ভেঙে গেল। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, অ্যাটম ভাঙা যায় এবং অ্যাটমও আবার অপরাপর বিভিন্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণার দ্বারা গঠিত। এর ফলে বিজ্ঞানের পুরনো ধারণাগুলির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল। সুতরাং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যে ধারণা, প্রতিটি বস্তু অপরাপর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণার দ্বারা গঠিত এবং তারা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত — বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সেই ধারণাগুলো আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

এবার আবার আগের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। সুতরাং নিউটনের বলবিদ্যা ও সেদিনকার 'অ্যাটমিক থিওরি'-কে ভিত্তি করে — যার অন্যতম মূল কথা হল অ্যাটম বা পরমাণুকে ভাঙা যায় না — যে বস্তুবাদ সেদিন গড়ে উঠল, তাহল যান্ত্রিক বস্তুবাদ। যদিও মনে রাখা দরকার যে, মানুষ আদিম যুগে যে বস্তুর চিন্তা করত, যে বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি, সেই বস্তুবাদী চিন্তাকে আদিম বস্তুবাদ বলা হয়। আবার নিউটনের যুগেও বস্তুসংক্রান্ত ধারণার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ছিল। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি ঘটে এবং বিশেষ করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী চিন্তাধারা গড়ে ওঠার স্তরে বস্তুসংক্রান্ত ধারণাগুলো যে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছায়, যে ধারণাগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের আলোকে ক্রমাগত আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে, তাতে নিউটনের সময়কার বস্তুবাদী চিন্তার অসম্পূর্ণতা (inadequacy) স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। একথা অনস্বীকার্য যে, সেদিনকার বস্তুবাদও স্বাভাবিকভাবেই বস্তুকে

নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে, বস্তুবাদী চিন্তাকেই প্রতিফলিত করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেদিন বস্তুবাদী চিন্তার মধ্যে প্রধানত দুটো মূলগত দুর্বলতা কাজ করেছে — যে দুর্বলতা সম্পর্কে এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আজকের বস্তু-ধারণার সাথে সেদিনকার বস্তু-ধারণাকে তুলনা করলে স্পষ্টতঃই অনেক অসম্পূর্ণতা বা 'ইনঅ্যাডিকোয়েসি' ধরা পড়ে। এই অসম্পূর্ণতাকে লক্ষ করেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মত একটি উন্নত বস্তুবাদী দর্শন গড়ে ওঠার পর অতীতের সমস্ত বস্তুবাদী দর্শনকে এক অর্থে ভাববাদী দর্শন বলা হয়। এই কারণেই বলা হয় যে, এই যান্ত্রিক বস্তুবাদী ধারণাগুলো বস্তুকে নিয়ে কারবার করলেও বস্তুসংক্রান্ত সত্যকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করতে পারেনি। অর্থাৎ, বস্তু সম্পর্কে যে সত্য ধারণার অধিকারী আজ আমরা হতে পেরেছি তার মাপকাঠিতে বিচার করলে এইসব যান্ত্রিক বস্তুবাদী ধারণা শুধু অসম্পূর্ণই নয়, আপেক্ষিক অর্থে কিছুটা অসত্য ধারণাও প্রতিফলিত করেছে। অর্থাৎ, যা সত্য নয় তাকেই সত্য বলে চালিয়েছে।

আমরা ভাববাদী নই কেন? ভাববাদের ত্রুটি বা গলদটা কোথায়? কারণ, ভাববাদ যুক্তি বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা, ইতিহাস বা কোনকিছুর দ্বারাই যাকে প্রমাণ করা যায় না, মানুষের জীবনের গতিপ্রবাহের ছন্দে যার অস্তিত্বের কোথাও কোন প্রমাণ নেই তাকেই সত্য বলে প্রচার করে চলেছে। ফলে সত্যদৃষ্টি গুলিয়ে যাচ্ছে। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করবার দৃষ্টি এবং বিচারশক্তিকে সেটা খর্ব করছে। এই কারণেই আমরা ভাববাদের বিরোধিতা করি, ঈশ্বরবাদের বিরোধিতা করি। নাহলে ঈশ্বরের সাথে আমাদের কোন বিরোধিতা নেই! আমাদের সামনে মূল প্রশ্ন হচ্ছে সত্য জানা, সত্যানুসন্ধান করা। তাই আমাদের লড়াই হ'ল, একদিকে সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শগত সংগ্রাম, অপরদিকে শ্রেণীশোষণ, শ্রেণীশাসন ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই। যাঁরা যথার্থই ধর্মে বিশ্বাস করেন, শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইতে তাঁদের সামিল করতে পারলে সেই লড়াই করতে করতেই তাঁদের ধর্মান্ধতা একদিন কেটে যাবে — আমার এ কথাটা আপনারা মনে রাখার চেষ্টা করবেন।

এখন, সত্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারার জন্য যে বস্তুবাদ সমস্যা সমাধানে অক্ষম তার সাথে ভাববাদ বা ঈশ্বরবাদের মূল পার্থক্য কতটুকু? কেননা, ভাববাদ বা ঈশ্বরবাদও সমস্যা সমাধানে অক্ষম। আমাদের শুধু বস্তু বা বস্তুবাদ বললেই চলবে না, বস্তু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়ে তোলাটাই হচ্ছে আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই দুই ধরনের দর্শনের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে প্রচুর ফারাক থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত এদের ফল বর্তাচ্ছে প্রায় একইরকম। তাই লেনিন বলেছিলেন যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ছাড়া অন্য সমস্ত বস্তুবাদই কার্যত ভাববাদ ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ছাড়া ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্ত বস্তুবাদী দর্শন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে ভাববাদেরই নামান্তর। তবে একটা কথা এখানে বলে যেতে চাই যে, আমরা যখন অন্যান্য বস্তুবাদকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে ভাববাদেরই নামান্তর বলে বলি — সেকথার অর্থ এরকম নয় যে, সেইসব বস্তুবাদকে আমরা ভাববাদেরই সমগোত্রীয় বলে মনে করি। ব্যাপারটা সেরকম নয়। আসলে এর দ্বারা যেটা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, তা হ'ল, দুনিয়ায় বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারা যেটা বহুদিন ধরে চলে আসছিল, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হ'ল তারই পথ বেয়ে গড়ে ওঠা সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাপদ্ধতি।

নিরীশ্বরবাদী মাত্রই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নয়

যেমন ধরুন, মানবতাবাদীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের নিরীশ্বরবাদী (atheist) বলে মনে করেন। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা ঈশ্বরবাদই বলুন বা মার্কসবাদ, পার্টি রাজনীতি বা শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বই বলুন — এইসব কিছুকেই একইসঙ্গে সমস্ত অনিষ্টের মূল কারণ বলে মনে করেন। তাঁদের মনোভাবটা অন্যরকম। তাঁদের অনেকের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটিই মূল। তাঁদের এই ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা বাস্তব বা সামাজিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল নয়। এ অনেকটা চরম স্বাধীনতার ধারণা — absolute freedom of the individual-এর ধারণা। যে সমস্ত চিন্তাশীল মানুষ এই ধরনের মতাদর্শের উপাসক, যাঁরা বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই চলতে চেয়েছেন, তাঁরা কিন্তু একবারও একটা কথা ভেবে দেখলেন না যে, দুনিয়াতে এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব বিজ্ঞান মেনে নেয়নি যা নাকি অপরিবর্তনীয় বা শাশ্বত। আবার একদল চিন্তাশীল মানুষ আছেন যাঁরা ঈশ্বরপূজায় বিশ্বাসী নন। ঈশ্বর মানেন না, চার্চে যাওয়াকে ভণ্ডামি বা অজ্ঞতা বলে মনে করেন, কিন্তু তাঁরা সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজের চিন্তাকে পরিচালিত করতে

পারেননি। ফলে শেষপর্যন্ত তাঁরা ভাববাদের খপ্পরেই পা দিয়েছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল, সার্ত্রে বা হাক্স্‌লের মত চিন্তাশীল মানুষদের সকলের চিন্তা পুরোপুরি এক না হলেও তাঁরা এ ব্যাপারে সমগোত্রীয়। এঁরা সকলেই কমবেশি বিজ্ঞানের পূজারি এবং বস্তুবাদকেই সাধারণত সমর্থন করে গেছেন। কিন্তু এঁরা সকলেই মানবতাবাদী এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ভাববাদী।

হেগেল-ফ্যুয়রবাখ-মার্কস

প্রসঙ্গক্রমে অপর দু'একটি বিষয় সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আপনারা অনেকেই জানেন যে, দর্শন জগতে হেগেল একটি বিশেষ নাম। আমার মনে হয়েছে, হেগেল ভাববাদী দার্শনিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। আপনারা যে দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল নিয়ম (principle), বা দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতির কথা শুনেছেন, হেগেলই সর্বপ্রথম সেই চিন্তাকে তুলে ধরেছেন। হেগেল বলেছেন, এই যে বিশ্বচরাচর, নানা ঘটনা, অর্থাৎ phenomenon, বস্তুজগত — যা কিছু আমরা দেখছি — সমস্ত কিছুই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া মেনে চলছে। কিন্তু, এ ধরনের বিশ্লেষণ তুলে ধরা সত্ত্বেও হেগেলের দর্শনকে কেন ভাববাদী দর্শন বলা হয় সেটা বোঝবার জন্য হেগেলের দর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও কিছু বলা দরকার। হেগেল বললেন, দুনিয়ার সবকিছুর মধ্যেই দ্বন্দ্ব বর্তমান। প্রতিটি সমাজ, অর্থাৎ, যে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। 'থিসিস' এবং 'অ্যান্টিথিসিস'-এর দ্বন্দ্বের ফলে যে সিন্‌থেসিস সূচিত হয় — এই চিন্তাও হেগেলরই চিন্তা। কিন্তু এতকিছু বলা সত্ত্বেও দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি শেষপর্যন্ত যে কাঠামোটা খাড়া করলেন, সেটা হল, বস্তু হচ্ছে 'অ্যাব্‌সলিউট আইডিয়া'র 'ডায়ালেক্‌টিক্যাল এক্সপ্রেশন'। অর্থাৎ, তিনি যে অ্যাব্‌সলিউট আইডিয়া-র কথা বললেন, সেই এ্যাব্‌সলিউট আইডিয়া হ'ল ডায়ালেক্‌টিক্যাল। কিন্তু, এর ফলে যে প্রশ্নটা দেখা দিল, তা হচ্ছে, আইডিয়া যদি ডায়ালেক্‌টিক্যাল হয়, তাহলে সেটা আবার অ্যাব্‌সলিউট হয় কী করে? অথবা, উল্টোদিক থেকে বললে — আইডিয়া যদি অ্যাব্‌সলিউট হয়, তাহলে সেটাই বা ডায়ালেক্‌টিক্যাল হয় কী করে? তিনি যেটা ধরে নিয়েছেন, তা হচ্ছে আইডিয়া হ'ল 'অরিজিনাল আইডিয়া'। কিন্তু তার মধ্যে স্ববিরোধী দ্বন্দ্ব আছে এবং সেই দ্বন্দ্বের ফলেই বাস্তব জগতের সৃষ্টি। তাঁর একথার মানে দাঁড়ায়, বাস্তব জগৎটা হচ্ছে একটা 'ইমেজ' এবং সেই অর্থেই সেটা হল অ্যাব্‌সলিউট আইডিয়া-র 'এক্সপ্রেশন'। সুতরাং হেগেলের ডায়ালেক্‌টিক্স হয়ে পড়ল ডায়ালেক্‌টিক্স অফ আইডিয়া। থিসিস-অ্যান্টিথিসিস-সিন্‌থেসিস হয়ে পড়ল চিন্তা বা ভাবজগতের পরিবর্তনের নিয়ম। অর্থাৎ, একটা বিষয় পরিষ্কার যে, বস্তু ও চিন্তার মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বস্তুর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ফলেই যে ভাবের সৃষ্টি — এই প্রক্রিয়াকে হেগেল ধরতে পারেননি। তাই হেগেলের দর্শন হয়ে পড়ল 'ডায়ালেক্‌টিক্যাল আইডিয়ালিজম', ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটেরিয়ালিজম নয়। এই কারণেই তাঁর দর্শন হয় পড়ল ভাববাদী দর্শন।

এর ফলে সেদিন কিছু বিপত্তিও দেখা দিয়েছিল। জার্মানিতে হেগেলের অনুগামীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদল হয়ে পড়লেন হেগেলের দর্শনের পুরোপুরি সমর্থক। আর একদল হলেন একটু বাম-ঘেঁষা — যাঁরা 'লেফট হেগেলিয়ান' বলে পরিচিত ছিলেন। এই বাম-ঘেঁষা হেগেলিয়ানদের মধ্যে ফ্যুয়রবাখও ছিলেন। তাঁরা হেগেলকে বললেন, তিনি যে অ্যাব্‌সলিউট আইডিয়ার কথা বলছেন সেই অ্যাব্‌সলিউট আইডিয়াই যদি 'অরিজিন' হয়, তাহলে দুনিয়াতে যা কিছু ঘটছে সেই সবকিছুই তো হচ্ছে অ্যাব্‌সলিউট আইডিয়ার ইমেজ বা এক্সপ্রেশন। তাহলে সেটাই তো 'রিয়্যাল'। আর যেটা রিয়্যাল সেটাই 'র‍্যাশনাল'। তাহলে তো বলতে হয়, চুরি করার মতো ঘটনা যেখানে রিয়্যাল, সেখানে সেটাও র‍্যাশনাল। তাহলে এ ধরনের অন্যায়ের জন্য সাজা দেবার প্রশ্ন আসছে কেন? হেগেল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললেন, তিনি এমন কথা বলেননি, তাঁর কথা বিকৃত করা হচ্ছে, তিনি যে কথা বলেননি তাঁর নামে সেসব কথা বলা হচ্ছে। নাহলে চুরি করার মত যে কোন অসামাজিক কাজকে কি র‍্যাশনাল বলা চলে? এ ধরনের কাজ কি কোনমতেই সমর্থনযোগ্য? হেগেলের সমালোচকরা বললেন, তিনি চুরি করাকেই সমর্থন করেছেন এমন কথা তাঁরা বলতে চাননি। কিন্তু দর্শনের যে কাঠামোটি তিনি খাড়া করেছেন, তাকে মেনে নিলে এমন সিদ্ধান্তে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাধারণভাবে এই ছিল লেফট হেগেলিয়ানদের সমালোচনা। ফ্যুয়রবাখ সমস্যার গোড়াটা ধরতে চেষ্টা করেছিলেন।

ফ্যুয়রবাখ ছিলেন হেগেলের ছাত্র। তিনি হেগেলের উদ্দেশে বললেন যে, তিনি দর্শনের কাঠামোটা এমনিতে খুবই সুন্দর দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বে, বস্তু একে অপরকে প্রভাবিত করছে। তিনি সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে, বস্তুর পরস্পরের সম্পর্ক হচ্ছে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্পর্ক। দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল নিয়ম (principle) সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলেছেন সেসবই ঠিক আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, তিনি যে অ্যাব্সলিউট আইডিয়া-র কথা বলেছেন সেই অ্যাব্সলিউট আইডিয়াকে নিয়ে। সুতরাং ফ্যুয়রবাখ বললেন, ঐ অ্যাব্সলিউট আইডিয়ার দরকার নেই। ওটা হেগেল কল্পনায় 'হাইপথেটিক্যালি' ধরে নিয়েছেন। তাই তিনি হেগেলকে ঐ অ্যাব্সলিউট আইডিয়া কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে বললেন। বললেন, তাহলেই আর কোন সমস্যা থাকবে না, সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়।

কিন্তু এর দ্বারা ফ্যুয়রবাখও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করতে পারলেন না। কারণ, তিনি মূল জায়গাটা ধরে এগোতে পারেননি। অ্যাব্সলিউট আইডিয়াটা সমস্যা সৃষ্টি করছে বলে তিনি ওটাকে বাদ দেবার প্রস্তাব করলেন। মনে করলেন, হেগেলের তত্ত্ব থেকে অ্যাব্সলিউট আইডিয়া কথাটি বাদ দিলেই হয়ে যাবে। তাহলে আর সামাজিক অন্যায়কে, সে চৌর্যবৃত্তি বা যাই হোক না কেন, অ্যাব্সলিউট আইডিয়ার প্রতিফলন হিসেবে র‍্যাশনাল বা সমর্থনযোগ্য বলে মনে করার কোন কারণ থাকবে না। তিনি অ্যাব্সলিউট আইডিয়াকে বাদ দিলেন, কিন্তু, ভাব বা চিন্তা কীভাবে জন্ম নেয়, বস্তু এবং ভাবের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কী — সেই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ধরতে পারলেন না। এই কারণেই ফ্যুয়রবাখও শেষরক্ষা করতে পারেননি। বস্তুজগতের পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও হেগেলের অ্যাব্সলিউট আইডিয়ার বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি আদর্শবাদের ওপর এমন জোর দিলেন যেন আদর্শবাদটা শাশ্বত, অচল, অনড়। নীতিনৈতিকতার ক্ষেত্রে তিনি স্থায়ী কতকগুলো অনুশাসন বেঁধে দিলেন, যে মূল্যবোধ ও আদর্শবাদই মানুষকে চিরকাল গাইড করবে। তিনি মনে করলেন, নাহলে মানুষের কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। ফলে, এই আদর্শবাদের ওপর তিনি এমন জোর দিলেন যাতে তাঁর চিন্তার মধ্যে দেখা গেল স্থবিরতা ও জড়ত্ব। ফলে, এতসব কথা বলেও ফ্যুয়রবাখও শেষপর্যন্ত ভাববাদের খপ্পরে পা দিলেন — মানবতাবাদী হয়ে পড়লেন। ইতিহাসে তিনি মানবতাবাদের অন্যতম উদগাতা হিসাবেই আজ স্বীকৃত। তাঁর দর্শনের বিরাট জায়গা জুড়ে রইল 'মরাল্স্ অ্যান্ড এথিকস', যে নীতি-নৈতিকতাকে মনে করা হয়েছে 'আনচেঞ্জেব্ল', অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ, কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে, বস্তুর পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাবজগতেরও যে পরিবর্তন ঘটে তাঁর বক্তব্যে সেটাকেই অস্বীকার করা হল। সুতরাং ফ্যুয়রবাখের মানবতাবাদ বা মানবিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত ধারণা অচল, অনড় হয়ে পড়ায় সেটা হল কার্যত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অস্বীকৃতি। ফলে, তাঁর চিন্তাও হয়ে পড়ল ঈশ্বরবাদেরই রকমফের বা নামান্তর মাত্র। ফ্যুয়রবাখ দর্শনের গোড়ায় আইডিয়াকে ছেঁটে বাদ দিলেও শেষ পর্যন্ত নীতি-নৈতিকতা তথা নৈতিক অনুশাসনকে শাশ্বত সত্যরূপে জিইয়ে রাখতে চাইলেন। ভাবকে বস্তুর 'প্রোডাক্ট' হিসেবে নয়, বস্তুর বাইরে স্থান দিলেন।

হেগেল ও ফ্যুয়রবাখের এই পটভূমিকায় এলেন কার্ল মার্কস। মার্কসও হেগেলের ছাত্র ছিলেন। তিনি একসময়ে হেগেলের দর্শন সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলেছিলেন যে, হেগেলের দর্শনে আর সবই ঠিক আছে, শুধু এইটুকু করতে হবে যে, সেখানে মাথার ওপর যেটা দাঁড় করানো হয়েছে তাকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। আবার, ফ্যুয়রবাখ যে তত্ত্ব খাড়া করলেন সে সম্পর্ক মার্কস তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তিনি বললেন, হেগেল যেমন অ্যাব্সলিউট আইডিয়ার মত বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তাকে জন্ম দিয়ে দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর এত সুন্দর বিশ্লেষণকেও শেষপর্যন্ত বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিলেন, অপরদিকে ফ্যুয়রবাখ বস্তুবাদের ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করেও নীতি-নৈতিকতা বা তার অনুশাসনকে অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত ধরে নিয়ে শেষপর্যন্ত মানবতাবাদী হয়ে পড়লেন তাই নয়, কার্যত দ্বন্দ্বতত্ত্বকেই অস্বীকার করে বসলেন। ফ্যুয়রবাখ এথিকস অ্যান্ড মরালিটি অ্যাব্সলিউট করে যে তত্ত্ব খাড়া করলেন সে সম্পর্কে মার্কস বললেন, ফ্যুয়রবাখের বক্তব্য যদি এই হয় তাহলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আর রইল কোথায়? এতো কেঁচে গণ্ডূষ করা হল। মার্কস যেটা দেখাতে চাইলেন, সেটা হ'ল, হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বে অন্য কিছু ভুল নয়। ভুল হচ্ছে এই যে, তিনি ধরে নিয়েছিলেন, বস্তু হ'ল ভাবের সৃষ্টি। এখানেই যত বিপত্তি। কিন্তু, ইতিহাস ও বিজ্ঞান থেকে আজ আমরা সকলেই জানতে পেরেছি যে, মন হচ্ছে a particular function of the human brain — অর্থাৎ, মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ ধরনের কার্যকলাপের ফলই হচ্ছে মন। আর, এই যে মস্তিষ্ক সেটাও বস্তুকণার দ্বারা গঠিত।

আমরা আগেই আলোচনা করে দেখেছি যে, বাস্তব জগৎ বা বহির্বিশ্ব মানুষের মস্তিষ্কের উন্নত গঠনের ফলে সে যে বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করেছে তার সাথে যুক্ত হয়েই ভাব বা চিন্তার জন্ম হয়েছে। তাই মার্কসবাদে ভাব বা চিন্তাকে বলা হয় product of matter, বস্তুর ক্রিয়ার ফল। বস্তু ও মনের সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়, দ্বান্দ্বিক। বস্তুজগত এবং পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা — এগুলোর সাথে আমাদের ভাবজগৎ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। আর, এই দুইয়ের সম্পর্ক হল দ্বন্দ্বমূলক — একে অপরকে প্রভাবিত করে।

জীবনের প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই সমাজে আদর্শবাদ ও নীতি-নৈতিকতার জন্ম হয়। কিন্তু, এই আদর্শবাদ ও নীতি-নৈতিকতার ধারণার কোন শাশ্বত রূপ নেই। আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ না থাকলে কোন সমাজ এগোতে পারে না। কিন্তু আজ যে আদর্শবাদ সমাজকে এগোতে সাহায্য করছে আগামীকাল আবার সেই আদর্শই সমাজের রাশ টেনে ধরছে, সমাজপ্রগতির বিরোধিতা করছে, মহাপ্রতিক্রিয়াশীল আদর্শে পরিণত হচ্ছে। এটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, মানুষের প্রয়োজন এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। তাই জীবনের নতুন প্রয়োজনকে ভিত্তি করে নতুন আদর্শবাদ জন্ম নেবেই। এইসব বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে যেসব প্রশ্ন সেদিন দেখা দিয়েছিল তার পুরোপুরি সঠিক উত্তর হেগেল বা ফ্যুয়রবাখ দিতে পারেননি। মার্কস-ই সর্বপ্রথম এই দুই দার্শনিকের চিন্তার সাহায্য নিয়ে তাকে আরও সমৃদ্ধ করে একটা সঠিক ও সত্য ধারণার ভিত্তি খাড়া করলেন। তিনি ভাব ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কই শুধু দেখাননি, তিনি একইসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে দেখালেন যে, এই দুইয়ের মধ্যে বস্তুই হচ্ছে প্রায়র্। এই 'প্রায়রিটি কনসেপশন'টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে কোনমতেই গোলমাল করা চলবে না। আমরা দেখতে পেলাম যে, কার্ল মার্কস জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে, এথিকস, মরালিটি, ভ্যালুজ্ সবকিছুকে যুক্ত করে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ধারণা গড়ে তুলেছিল তাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে, অর্থাৎ, 'ট্র্যানসেন্ড' করে বা উত্তরণ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী ধারণার জন্ম দিলেন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের একটা পুরো কাঠামো খাড়া করলেন — যে আদর্শবাদকে ভিত্তি করে মানুষ লড়বে, অভীষ্ট লাভ করবে, শ্রমিকশ্রেণীর নতুন সমাজব্যবস্থা, নতুন জীবন গড়ে তুলবে। আর, আমি মনে করি, মার্কসবাদী দর্শনের 'নোবিলিটি' বা মহত্ত্ব এখানেই লুক্কায়িত আছে।

আপনারা জানেন যে, বস্তুসংক্রান্ত অতীতের ধারণাও পাল্টে গেছে। নিউটনের সময় বস্তুকে যেভাবে জড় বস্তু হিসেবে ভাবা হয়েছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে সেই ধারণাও পাল্টে গেছে। আজকের বস্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তু (dialectical matter)। এখানে যান্ত্রিকতার কোন স্থান নেই। তাই মার্কসবাদ বলছে, আমরা বিশ্বচরাচরে যা দেখছি সমস্ত কিছুই বস্তুর বৈচিত্র্যময় প্রকাশ। আমরা জানতে পারি বা না পারি, বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি সত্তার মধ্যেই দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ হচ্ছে। তাহলে মার্কসবাদীদের কাজ কী? মার্কসবাদীদের কাজ হচ্ছে, প্রতি ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষকে খুঁজে বের করা, তার চরিত্রকে নির্ধারণ করা এবং তারই ভিত্তিতে সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করা। সুতরাং, এই যে দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি — যে বিচারপদ্ধতি কোন কিছুকেই পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদাভাবে বিচার করে না — এই বিচারপদ্ধতিকে ঠিকমত আয়ত্ত করতে না পারলে আমরা সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাব না। একথাও মনে রাখতে হবে যে, যেকোন জিনিসের মধ্যে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, তার মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলছে, সমন্বয়ের প্রক্রিয়া কাজ করছে, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা ক্রমাগত স্বচ্ছ হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের আলোকে আমাদের চিন্তা আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং ক্রমাগত হয়ে চলবে। বিজ্ঞানকে মানলে একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এখন এই বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে একথা বলা চলে কি যে, মার্কসবাদী চিন্তা পুরনো বা অকেজো হয়ে গেছে এবং সেটা অচল? বরং, একদিকে ক্রমাগত বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ভিত্তিতে বস্তুসংক্রান্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ ধারণাকে আয়ত্ত করা, অপরদিকে পরিবর্তনের কারণসমূহের মর্মবস্তুকে (essence) উপলব্ধি করতে পারলে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতিকে মার্কসবাদের মূলনীতি অনুসরণ করেই উন্নত ও সমৃদ্ধ করা এবং প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে এই মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেই সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে — কিন্তু, একে অচল বলে পরিত্যাগ করার প্রশ্ন আসে না।

আবার দেখুন, মার্কসবাদ বলছে যে, দুনিয়াতে এমন কিছু নেই যা বস্তুর সাথে সম্পর্কহীন। অর্থাৎ, এই দুনিয়া হচ্ছে বস্তুময়। এমনকী, আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, মনের সাথেও বস্তুর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। আর, এই বস্তুর ক্রিয়াকলাপের ধরন হচ্ছে যে, এর কোনটাই কোনটার সাথে সম্পর্কহীন নয় এবং

প্রতিটি বস্তুকণা পরস্পর নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত। আবার প্রতিটি বস্তুকণার মধ্যেই পরস্পর বিরোধী শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দুই দ্বন্দ্বের ফলেই ক্রমাগত বস্তুর পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে, দ্বন্দ্বের চরিত্র দুই প্রকার — অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব। এ সম্পর্কে মূল আলোচনা আমি পরে করব। আমি এখানে শুধু এটুকুই বলে যেতে চাই যে, এই দ্বন্দ্বের পথ বেয়েই প্রকৃতিজগতের প্রতিটি পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। ফলে, সংঘর্ষ বা লড়াইয়ের পথকে এড়িয়ে গিয়ে মার্কসবাদী হওয়া যায় না।

শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন ও মার্কসবাদ

এ প্রসঙ্গে আর একটি দিক আলোচনা করে যাই। কোন কোন মার্কসবাদী দার্শনিক মার্কসবাদকে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। বিষয়টাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে এতে অসুবিধে কিছু নেই। নাহলে বিপত্তি হতে পারে। আজকের দিনের মানবসমাজের প্রগতির প্রশ্ন, সমস্ত সংকট থেকে মুক্তির প্রশ্ন, সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার প্রশ্নটি শ্রমিক বিপ্লব তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তার জন্য উপযুক্ত সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ও তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে এবং এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হল মার্কসবাদ। অর্থাৎ, গোটা মানবসভ্যতার স্বার্থের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ একীভূত বা 'আইডেন্টিফায়েড' হয়ে পড়েছে এবং এই অর্থে শ্রমিকশ্রেণী আজ প্রতিনিধিত্ব করছে গোটা মানবসমাজ ও মানবসভ্যতার স্বার্থকে। ফলে, আজকের দুনিয়াতে যেখানে গোটা সমাজের মুক্তির প্রশ্নটি শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং মার্কসবাদ যেখানে ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রাম বা লড়াইয়ের হাতিয়ার, সেখানে একমাত্র এই অর্থেই মার্কসবাদকে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন বলা চলে।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমি অন্য একটি দিকের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। মার্কসবাদকে যদি শুধু শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন বলা হয় তাহলে সুধী সমাজের মানসিকতায় কিছুটা আঘাত লাগতে পারে। মার্কসবাদের শিক্ষা অনুযায়ী আমরা জানি, সমাজ অগ্রগতির যে ইতিহাস-নির্দেশিত পথ — মানুষের সচেতন ও সঠিক ভূমিকা পালনের ওপর যেটা নির্ভরশীল — সেই পথ বেয়ে একদিন মানবসমাজ শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থায় পদক্ষেপ করবে। এখন, স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন এসে যায়, তা হচ্ছে, মার্কসবাদকে যদি আমরা শ্রেণীদর্শন, অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন বলি — তাহলে সেই শ্রেণীহীন সমাজে কি মার্কসবাদের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কার একথা বোঝা দরকার, সেক্ষেত্রেও মার্কসবাদের কার্যকারিতা শেষ হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না, বা আসতেই পারে না। কারণ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও জয়যাত্রার যেমন শেষ নেই, তা যেমন ক্রমাগত উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে, তেমনি মার্কসবাদও একটা সামগ্রিক বিজ্ঞান বা সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান (science of all sciences) হিসেবে ক্রমাগত উন্নত, সমৃদ্ধ ও আরও সৃজনশীল চরিত্র অর্জন করবে। ফলে, সুদূর ভবিষ্যতেও মার্কসবাদ সমাজের অগ্রগতির সঠিক পথনির্দেশ করবে এবং দুনিয়ার পরিবর্তনের নিয়মকে অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। তাই বলছিলাম যে, একটা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে আজকের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে বোঝাবার জন্য, সমাজের স্বার্থের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ যেভাবে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে সেটাকে নির্দেশিত করার জন্য মার্কসবাদকে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন বলা চললেও এর দ্বারা অজান্তে হলেও মার্কসবাদের যে বিশ্বজনীন আবেদন, 'ইউনিভার্সাল অ্যাপ্রোচ' এবং বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন হিসেবে এর যে অমোঘ কার্যকারিতা তাকে যেন কিছুটা খর্ব করা হয়।

বস্তুর অভ্যন্তরেই বস্তুর গতির কারণ নিহিত

এখন, আবার বস্তু সংক্রান্ত আলোচনায় আমাদের ফিরে আসা যাক। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, নিউটনের যুগে বস্তুকে জড় বস্তু হিসেবে ভাবা হয়েছে, যেহেতু বস্তুর গতির কারণ সেদিন জানা যায়নি এবং বিজ্ঞানের আপেক্ষিক অনগ্রসরতার জন্য বস্তু সংক্রান্ত ধারণাও সেদিন অনেকটা পিছিয়ে ছিল। বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন, কোন বস্তুই নিরেট বা জড় বস্তু নয়। বস্তুর এক ধরনের অবস্থান বা form of existence-কে ভর বা mass বলা হয়, আবার আর এক ধরনের অবস্থান বা form of existence-কে বলা হয় শক্তি বা 'এনার্জি'। এই ভর ও শক্তি, অর্থাৎ, mass and energy নিয়েই বস্তু বা 'ম্যাটার'-এর অবস্থান। তাছাড়া, শক্তি বা এনার্জিকে আজ আর নন-মেটিরিয়াল ধরা হয় না। অ্যাটম বা পরমাণু ভেঙে যাওয়া, 'রেডিও-অ্যাক্টিভিটি' বা তেজস্ক্রিয়তা এবং 'থিওরি অভ রিলেটিভিটি' বা আপেক্ষিক তত্ত্ব ইত্যাদিকে ভিত্তি করে বস্তু

সম্পর্কে আজ যে ধারণা গড়ে উঠেছে তাতে বস্তুর গতির উৎস খোঁজার জন্য বস্তুর বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, বস্তুর যে তিনটি অবস্থা, অর্থাৎ, কঠিন, তরল ও বায়বীয় — এই তিনটি অবস্থার মধ্যে তরল ও বায়বীয় অবস্থাতেই গতিশীলতা বা 'কাইনেটিক্স' আছে তাই নয়, kinetics of solid state of matter আজ বিজ্ঞানের ছাত্রদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। এখানে গতিশীলতা বলতে কঠিন পদার্থের আভ্যন্তরীণ গতিশীলতাকেই বোঝানো হচ্ছে। এই সব কিছু মিলেই আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, বস্তুর অভ্যন্তরেই রয়েছে বস্তুর গতির মূল কারণ — অর্থাৎ, basic cause of motion of matter is therefore internal। তাছাড়া বিজ্ঞান বলছে, দুনিয়ার সমস্ত কিছু নিয়ত পরিবর্তনশীল। সামাজিক অবস্থা, নিয়মকানুন, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, এমনকী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণাও কোথাও স্থিরভাবে বসে নেই। তাই বিজ্ঞানে আজ বলা হয়, motion is the mode of existence of matter। একথার অর্থ হচ্ছে, বস্তু অবস্থান করে মানেই সে গতির মধ্যে অবস্থান করে। গতি ছাড়া বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব। বস্তু নিয়ত গতিশীল। গতি হল বস্তুর অবস্থানের ধরন। এটাই হ'ল আধুনিক বিজ্ঞানে বস্তুর গতিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত।

অ্যাব্সলিউট ভ্যাকুয়াম বলে কিছু নেই

বস্তুর গতি সংক্রান্ত এই ধারণার সাথে আরও দু'টি বিষয় যুক্ত হয়ে আছে। সেটা হচ্ছে ব্যাপ্তিস্থান (space) এবং সময় (time)। একটা সময় ছিল যখন আমরা ফাঁকা জায়গাকে 'ভ্যাকুয়াম' বা শূন্য বলে মনে করতাম। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে, দুনিয়াতে অ্যাব্সলিউট ভ্যাকুয়াম বলে কিছু নেই। আমরা যেটাকে ফাঁকা জায়গা বলে মনে করি সেটা আপেক্ষিক অর্থে ফাঁকা, কিন্তু অ্যাব্সলিউট অর্থে ফাঁকা নয়। 'ইন্টারস্টেলার স্পেসকে'ও বা সৌরজগত বহির্ভূত স্থানকেও একসময়ে ভ্যাকুয়াম বা ফাঁকা মনে করা হত। কিন্তু, আজ আমরা জানতে পেরেছি যে, যেটাকে আমরা স্পেস বলি, সেটা বস্তুরই স্পেস। তাই ইন্টারস্টেলার স্পেসটাও packed up with matter, অর্থাৎ, বস্তুতে ঠাসা। এখানে বস্তু মূলত 'রেডিয়েশন', অর্থাৎ, বিকিরণরূপে অবস্থান করে।[১] আধুনিক বিজ্ঞানের এইসব ধারণা গড়ে ওঠার পর 'প্রোপাগেশন অভ লাইট' সংক্রান্ত ধারণাও পাল্টে গেছে। বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে, প্রোপাগেশন অভ লাইটকে 'ওয়েভ থিওরি'র সাহায্যে একসময় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওয়েভ থিওরির সাহায্যে আলোর চলাচলকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে হয়েছে যে, শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে না। সেই কারণেই হাইপোথেটিক্যালি তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, যেটাকে আমরা শূন্যস্থান বলছি সেখানেও একটি মাধ্যম বা মিডিয়াম-এর অস্তিত্ব আছে, যাকে বলা হত 'ইথার'। ইথারকে ভাবা হয়েছিল এমন একটা মাধ্যম হিসেবে যার ভর (mass) নেই, কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) আছে। কিন্তু, বৈজ্ঞানিকেরা কিছুদিনের মধ্যেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এই হাইপোথেসিস-এর অসারতা ধরতে পারেন। তাঁদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, এই যে ইলাস্টিসিটির কথা বলা হচ্ছে, সেটা কিসের ইলাস্টিসিটি? কারণ, mass বা ভরই যদি না থাকে, তাহলে ইলাস্টিসিটি থাকতে পারে না। বস্তু বা ম্যাটার-এর অন্যতম গুণ বা 'প্রপার্টি' হল ইলাস্টিসিটি। তাই mass ছাড়া ইলাস্টিসিটি থাকা সম্ভব নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নতুন ধ্যানধারণার ভিত্তিতে আজ ইথার হাইপোথেসিসকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। তাই বলছিলাম, আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে, দুনিয়াতে কোথাও এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই।[২] বস্তু আছে মানেই হল সে কিছু না কিছু স্পেস occupy করে। আর, সেই স্পেসটা যে বস্তুরই স্পেস, সেটাও আমরা আগে আলোচনা করেছি।

বস্তুনিরপেক্ষ কালের ধারণা বিজ্ঞানবিরোধী

এবার টাইম বা সময়সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করা যাক। সময় বলতে আমরা কী বুঝি? কোন কিছু পরিবর্তনের কাল বা পিরিয়ডকেই আমরা বলি সময়। একইভাবে বস্তুর রূপান্তরের কালকেও আমরা সময় বলি। সুতরাং, বস্তুর অস্তিত্ব নিরপেক্ষ বা তার গতি বা পরিবর্তন থেকে বিচ্ছিন্ন কালের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অর্থাৎ, বস্তুর অস্তিত্বকে টাইম অ্যান্ড স্পেস-এ অস্তিত্ব হিসেবেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ, বস্তুকে আমরা যেমন সময় ও ব্যাপ্তিস্থান থেকে আলাদা করতে পারি না, ঠিক একইভাবে সময় ও ব্যাপ্তিস্থানকে বস্তুর অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। ফলে, বস্তু আছে মানেই হল কালের মধ্যে সে অবস্থান করে এবং কালের ছন্দে সে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই কারণেই সময় (time) ও ব্যাপ্তিস্থান (space)-কে বলা হয় condition of existence

of matter। আর 'মোশান' কী? Motion is the mode of existence of matter। এখন, সময়কে যেহেতু বস্তু থেকে আলাদা করা যায় না, সেই কারণে বস্তুর অস্তিত্বের বাইরে মহাকালের ধারণাও অলীক ছাড়া কিছু নয়। বা, কোন এক সময়ে এসে বস্তুজগত কেউ সৃষ্টি করল এহেন ধারণাও অসার। কেননা, আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নিই যে, কোন এক বিশেষ মুহূর্তে বস্তু বা বস্তুজগত সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে, সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশ্ন না এসে পারে না যে, যদি কোন এক বিশেষ মুহূর্তে বস্তু বা বস্তুজগত সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তার আগের মুহূর্তকে আমরা বুঝব কীভাবে? সেক্ষেত্রে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, সেই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত বস্তু, ভর, শক্তি, ব্যাপ্তিস্থান (space) ইত্যাদি কোন কিছুই অবস্থান করত না। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে বস্তুর অস্তিত্ব নিরপেক্ষ, তার গতি বা পরিবর্তন নিরপেক্ষ সময়ের অস্তিত্বকে কি কোনমতেই কল্পনা করা সম্ভব? নাকি, এমন কিছু থাকতে পারে? আসলে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। তাই বিশেষ বস্তুর সৃষ্টি বা রূপান্তরের প্রশ্ন থাকলেও সামগ্রিকভাবে বস্তু বা বস্তুজগতের সৃষ্টির প্রশ্নটি বিজ্ঞানবিরোধী। তাছাড়া বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানও যাঁদের আছে তাঁরা সকলেই জানেন যে, out of nothing matter cannot be created, অর্থাৎ, কোন কিছু থেকে শুরু না করে কোন বস্তুই সৃষ্টি করা যায় না। ঠিক একইভাবে বস্তুর রূপের (form) পরিবর্তন সম্ভব হলেও বা এমনকী ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা গেলেও বস্তুকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। অর্থাৎ, এককথায় বলতে গেলে বস্তুকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করার চিন্তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু বিজ্ঞানের এত কিছু আবিষ্কারের পরেও মানুষ আজও বস্তুজগতের সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে ছুটে চলেছে, আর কল্পনা করছে মহাকালের, যে মহাকালের ধারণা এই কারণেই অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

বস্তুর আদি বা সৃষ্টির প্রশ্ন

আপনারা সকলেই জানেন যে, দুনিয়াই বলুন বা মানুষই বলুন, এসবের সৃষ্টিকর্তা কে — এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে গোড়া বা আদির প্রশ্নটি মানুষের মনে বার বার ধাক্কা দিয়েছে। বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের অনেক কিছু বোঝবার পরেও বহু মানুষের মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, আমাদের আদি কী এবং শেষ কোথায়? এখনও বার বার এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। একথা ঠিক, একদিন এই প্রশ্নটি জ্ঞানজগতের খুব একটা গুরুগম্ভীর প্রশ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাপকাঠিতে বিচার করলে এ ধরনের প্রশ্নকে অজ্ঞতাপ্রসূত বলেই মনে করা হয়। কেননা, বিজ্ঞানে আজ গোড়া বলতে কোন বিশেষ জিনিসের গোড়া বোঝায়, শেষ বলতে কোন বিশেষ জিনিসের শেষ বোঝায়। সবকিছুর গোড়া বা সবকিছুর শেষ — এমন প্রশ্নই আজ আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য বা tenable নয়। অন্যদিক থেকে বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বললে বুঝতে সুবিধে হবে। যেমন ধরুন, সামনে-পেছনের প্রশ্ন। কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন, আমাদের সামনের দিক কোন্‌টা, বা পেছনের দিক কোন্‌টা, তাহলে সেটা যে কোনও বিশেষ জিনিসের সামনের বা পেছনের দিক বলা হচ্ছে সেটা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না। ধরুন, এই ক্লাসে আমরা যারা ডায়াস-এ বসে আছি তাঁদের থেকে যদি শুরু করি, তাহলে আমাদের সামনের দিক কোন্‌টা হবে? 'অ্যারো' (arrow) দিয়ে বোঝানো যায় যে, আপনারা যাঁরা ডায়াস-এর দিকে মুখ করে বসে শুনছেন, তাঁরাই আমাদের সামনে বসে আছেন। আবার, আপনারা যাঁরা হলে বসে আলোচনা শুনছেন, যদি তাঁদের থেকে শুরু করি, তাহলে আপনাদের সামনের দিক কোন্‌টা হবে? সেটাও অ্যারো দিয়ে বোঝানো যায় যে, আমরা যারা ডায়াস-এ বসে আছি, সেটা হ'ল আপনাদের সামনের দিক। তাহলে, দেখতে পাচ্ছেন, সামনে বা পেছনের ধারণাটা নির্ভর করছে একটা বিশেষ অবস্থানের ওপর — with respect to or in relation to a particular position। অর্থাৎ, সামনে-পেছনের ধারণাটা হচ্ছে আপেক্ষিক। অ্যাব্‌সলিউট বা নির্বিশেষ সামনে বা পেছনে বলে কিছু নেই। ঠিক তেমনি অ্যাব্‌সলিউট গোড়া বা শেষ বলেও কিছু নেই, বিশেষ বস্তুর গোড়া আছে এবং শেষ আছে। ফলে, কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, দুনিয়াতে যত মানুষ আছে — তাদের সামনের দিক কোন্‌টা, সেটা যেমন অর্থহীন দাঁড়াবে, তেমনি কেউ যদি প্রশ্ন করেন, সমস্ত বস্তুর গোড়া কী, সেটাও একইভাবে অর্থহীন দাঁড়াবে।

একইভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন উদাহরণ থেকে আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাব। ধরুন, আমরা যদি জল থেকে শুরু করি, তাতে এসিড দিয়ে তার মধ্য দিয়ে current pass করালে জল ভেঙে গিয়ে আমরা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুটো গ্যাস পাব। এখানে আমরা শুরু করেছি কোথা থেকে? শুরু করেছি জল থেকে। সেটা শেষ হচ্ছে কোথায়? শেষ হচ্ছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে। আবার উল্টো দিক থেকে ধরুন।

আমরা যদি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থেকে শুরু করি এবং বিশেষ প্রক্রিয়ায় এবং বিশেষ অনুপাতে তাদের মিলন ঘটাই, তাহলে এই দুই গ্যাসের মিলনের ফলে আমরা জল পাব। সেক্ষেত্রে গোড়া কী? গোড়ায় হচ্ছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। শেষ কী? শেষ হচ্ছে জল। এই হ'ল বিষয়। এর পরেও যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন যে, দুনিয়াতে যা কিছু আছে — অজৈব পদার্থ, জৈব পদার্থ, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, ইলেকট্রন, প্রোটন যা কিছু আছে — এই সবকিছুর 'অরিজিন' কী? স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এই প্রশ্নটি অবৈজ্ঞানিক এবং এধরনের ধারণা ভ্রান্ত। তাই বলছিলাম, কোন একটা বিশেষ বস্তুর শুরু আছে। কিন্তু, সমস্ত কিছুর সাধারণ শুরু বা কমন অরিজিন নেই, থাকতে পারে না। সুতরাং, আপনাদের বুঝে নিতে হবে যে, সামনে-পেছনে, শুরু-শেষ — এইসব ধারণাগুলো 'রিলেটিভ' বা আপেক্ষিক।

কোন কোন মহল থেকে আপেক্ষিকতার ধারণাকে বিকৃত করার চেষ্টা হয়েছে। আপেক্ষিকতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার ফলে কেউ কেউ বলেছেন, সব কিছুই যদি আপেক্ষিক হয় তাহলে তো বলতে পারা যায় যে, এই বস্তুজগত বা দুনিয়ার অস্তিত্বটাই আপেক্ষিক, এটা মানুষের চেতনা বা মনের ওপর নির্ভরশীল। আসলে এই ধরনের প্রশ্ন যাঁরা তোলেন তাঁরা আপেক্ষিকতাকে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে বুঝেছেন তাই নয়, তাঁরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যকেই ভুলে গেছেন। একথাও কারও অজানা নয় এবং ইতিহাস ও বিজ্ঞানেও এটা প্রমাণিত সত্য যে, বস্তুজগতের বিকাশের পথে একটা বিশেষ স্তরে এসেই মনের আবির্ভাব ঘটেছে। তাই চেতনা এবং মনের অস্তিত্বের ওপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল — এরকম চিন্তার কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। একথা অনস্বীকার্য যে, চেতনা-নিরপেক্ষভাবে বস্তুজগত ও দুনিয়ার অস্তিত্বের বিষয়টি আজ প্রশ্নাতীত এবং বিজ্ঞানে এই সত্য স্বীকৃত।

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করে গেছি যে, একসময় পরমাণু বা অ্যাটমকে ভাঙা যায়নি। সেইসময় অ্যাটমকে 'আনব্রেকেব্‌ল্' মনে করা হত। মনে করা হত, পরমাণু বা অ্যাটমকে ভাঙা যায় না। কোন কোন বৈজ্ঞানিক এমনও বলে বসলেন যে, অ্যাটমকে ভাঙা যাবে না। এই ধারণাকে ভিত্তি করেই বস্ত জগতে অরিজিন বা মৌলিক বস্তুকণার ধারণা গড়ে উঠেছিল। অরিজিন সংক্রান্ত এই ধারণা সে যুগে দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান ও দর্শনের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। সেদিন একটিমাত্র কণ্ঠস্বর এর প্রতিবাদ করেছিল। তিনি হলেন এঙ্গেলস্। তিনি সেইসব বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, they are going against the ethics of science। অর্থাৎ, তাঁরা বিজ্ঞানের এথিক্স-এর বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। কেননা, আজ অ্যাটমকে ভাঙা যাচ্ছে না, একথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে ভবিষ্যতে অ্যাটমকে কোনদিন ভাঙা যাবে না, এটা বলা চলে কি? বৈজ্ঞানিকদের তো একটা এথিক্স মেনে চলতে হবে।

আজ একথা সকলেই জানেন যে, অ্যাটম শুধু ভেঙে গেল তাই নয়, এই ঘটনা ঘটার পর বস্তুর অরিজিন বা আদি সংক্রান্ত যে ধারণা সেটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কোন সূক্ষ্মবস্তুকেই আজ আর নতুন করে অরিজিন বা আদি বলে মনে করা হয় না। বৈজ্ঞানিকরা আজ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যেকোন ক্ষুদ্র বস্তুকণা হচ্ছে আরও কতকগুলো ক্ষুদ্রতর বস্তুকণার সমষ্টি — any small particle is an assembly of some other smaller particles। সুতরাং, এই ব্যাখ্যার পর অরিজিন-এর থিওরি আর দাঁড়ায় না — দাঁড়াবার কোন জায়গা নেই।

এটা হ'ল একটা দিক। আবার ইলেকট্রন আবিষ্কারের পরেও একটা সময়ে ইলেকট্রন-এর চরিত্র কী, অর্থাৎ, তা পার্টিক্‌ল্ না ওয়েভ এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা বিরাট মতপার্থক্য দেখা গেছে। ফরাসি বৈজ্ঞানিক ডি-ব্রগলি তত্ত্বের সাহায্যে দেখালেন যে, ইলেকট্রন — যেটা এতদিন পার্টিক্‌ল্ হিসাবেই জানা ছিল — তার একই সাথে ওয়েভ চরিত্রও আছে। তখন থেকে মতবিরোধ শুরু হল। এই মতবিরোধ চলেছে দীর্ঘদিন। একদল বৈজ্ঞানিক কিছু কিছু পরীক্ষার সাহায্যে ইলেকট্রনের পার্টিক্‌ল্ ক্যারেক্টার প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করেন। আবার, একদল বৈজ্ঞানিক অন্য কিছু পরীক্ষার সাহায্যে ইলেকট্রনের ওয়েভ ক্যারেক্টার প্রমাণ করেন। ফলে, এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দুটো মতবাদ গড়ে ওঠে। তাঁরা এক এক দল এক এক মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন এবং একে অপরের মতবাদকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

আমরা আগেও দেখেছি যে, বস্তুর যে ভর (mass) এবং শক্তি (energy) — এই দুটোই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং শুধু তাই নয়, একটাকে অপর একটায় রূপান্তরিত করা যায়। এখন, ডি-ব্রগলি দেখালেন যে, প্রতিটি বস্তুকণারই একই সাথে পার্টিক্‌ল্ এবং ওয়েভ ক্যারেক্টার থাকে। অবস্থার তারতম্য অনুসারে এক একটি

পরিপ্রেক্ষিতে এর কোন একটি দিক প্রাধান্য বিস্তার করে, অপরদিকটি তুলনামূলকভাবে কম পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য — বিজ্ঞানের ভাষায় যেগুলোকে 'ম্যাক্রোবডি' বলা হয় — সেইসব ক্ষেত্রে বস্তুর mass বা পার্টিকল চরিত্রই প্রধান থাকে, ওয়েভ-এর অস্তিত্ব থাকে নগণ্য। আবার, বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার ক্ষেত্রে — যেগুলো সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় — সেগুলোর mass বা পার্টিক্‌ল্‌ চরিত্র অনুভূত হয় কোন কোন পরিপ্রেক্ষিতে, আবার ওয়েভ-এর দিকটা অনুভূত হয় অন্য অন্য পরিপ্রেক্ষিতে। আইনস্টাইন-এর থিওরি অভ রিলেটিভিটির সাহায্যে ডি-ব্রগলি'র এই 'ওয়েভ-পার্টিক্‌ল্‌ ডুয়ালিটি'-র তত্ত্ব এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই মতবিরোধের অবসান ঘটে বলেই আমি মনে করি। সুতরাং, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বস্তুর যে দ্বন্দ্বের অস্তিত্বের কথা ভাবা হয়েছে তার সাথে বস্তুর এই 'ওয়েভ-পার্টিক্‌ল্‌' তত্ত্বের কোন বিরোধ নেই।

একই কাজের পেছনে অনেক কারণ থাকার ধারণা ভ্রান্ত

এবার আর একটি প্রসঙ্গে আসা যাক। বিজ্ঞান ও দর্শনের একটা মস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল কার্যকারণ সম্পর্ক, অর্থাৎ, 'ল অভ কজালিটি' সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলা। আমরা সকলেই জানি যে, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটছে সমস্ত কিছুই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ, প্রতিটি ঘটনা 'ল-গভার্নড'। 'ল' সংক্রান্ত আলোচনার বহু দিক আছে, বিশেষ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ম সংক্রান্ত যে আলোচনা, আমি তার মধ্যে এখন ঢুকতে চাইছি না। কিন্তু, বিজ্ঞান ও দর্শন সংক্রান্ত প্রশ্নের সাথে যুক্ত কিছু কিছু দিক আমি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে যেতে চাই। যেমন, একটি প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপিত হয় যে, কোন একটি কার্যের পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে কিনা। এ ব্যাপারে 'লজিশিয়ান'রা আজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, একটি কার্যের পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে না। তাঁরা পরিষ্কার বলেছেন যে, plurality of causes is a wrong conception — অর্থাৎ, একই কাজের পেছনে অনেক কারণ থাকার ধারণা ভ্রান্ত। তাঁদের বক্তব্য হল, আমরা যেগুলোকে অনেক সময় 'কজ্‌' বলছি, একটি কার্যের পেছনে অনেক কারণ আছে বলছি, সেগুলো কজ্‌ বা কারণ নয়, সেগুলোকে বলা উচিত 'ফ্যাক্টর' বা কন্ডিশন। বিভিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতির মিলনেই কারণ বা কজ্‌-এর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, বিভিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতির মিলনের প্রক্রিয়ায় যে মুহূর্তে কারণটা পরিপক্কতা (maturity) লাভ করে সেই মুহূর্তেই কার্য বা 'এফেক্ট'টাও ঘটে। এই দিকটা বোঝাতে গিয়েই বলা হয়, what is cause that is effect, or, cause is the immediate antecedent of effect — যাহা কারণ তাহাই ফল, অথবা, কারণ হচ্ছে ফলের ঠিক আগের মুহূর্ত।

তাই 'প্লুরালিটি অভ কজ্‌' মেনে নেবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই ধারণা অসত্য বলেই একে মেনে নেওয়া চলে না। মেনে নিলে অনেক বিপত্তি হবে। যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে, একটি কার্য বহু কারণের জন্য ঘটতে পারে, তাহলে কোন একটা বিশেষ সমস্যার সমাধানের পথ একটাই — একথা কোনমতেই সঠিক হতে পারে না। এর অর্থ দাঁড়াবে যে, কমিউনিস্টরা যে বিপ্লব এবং সর্বহারার একনায়কত্বের কথা বলছেন, এবং বলছেন যে, বিশ্ববিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার পথে ব্যক্তিবাদের অবসান ঘটিয়ে, রুচিসংস্কৃতির উন্নত মান অর্জনের পথে একদিন বিশ্বসাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এটাই একমাত্র ইতিহাস নির্দেশিত পথ, এর বাইরে আর কিছু হতে পারে না — এই বক্তব্য চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। মনে হবে, এটা অনেকটা ছক কেটে বলার মত হয়ে গেল। ফলে, যে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি প্লুরালিটি অফ কজ্‌-এর কথা বলছেন, তাঁরা অজান্তে হলেও এই ধারণার আড়ালে শুধু বিজ্ঞানবিরোধী কথা বলছেন তাই নয়, সাম্যবাদী মতাদর্শের ভিত্তিমূলেই আঘাত হানতে চাইছেন।

শুধু 'লজিশিয়ান'রাই নন, বৈজ্ঞানিকরাও আজ বিজ্ঞানজগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে (field-এ) এই কজ্‌-এফেক্ট রিলেশান বা ল অফ কজালিটি, অর্থাৎ, কার্যকারণ সম্পর্ককে মেনে নিয়েছেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে একটা বিভ্রান্তি আমি লক্ষ করেছি। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করছেন যে, 'ডিটারমিনিজম' বা 'ডিটারমিনিস্ট ল'কে, যেটা ল অফ কজালিটি-রই ভিন্ন অভিব্যক্তি, মেনে নিলে 'প্রোবেবিলিটি'কে মানা যায় না। ঠিক একইভাবে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা বলেন, প্রোবেবিলিটিকে মেনে নিলে ডিটারমিনিজম মানা যায় না। এইভাবে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শুধু সাধারণ স্তরের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই নয়, এমনকি ডি-ব্রগলি'র মত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। আসলে বিষয়টা কী?

প্রোবেবিলিটি ও ডিটারমিনিজম্-এর ধারণা পরস্পরবিরোধী নয়

প্রথমত, আপনাদের সকলেরই জানা দরকার যে, প্রোবেবিলিটিও সায়েন্টিফিক বেসিস্-এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে — অর্থাৎ, এটাও একটা সায়েন্স। তাই বিজ্ঞানে প্রোবেবিলিটিকে অস্বীকার করার প্রশ্নই আসে না। আবার অন্যদিক থেকে ডিটারমিনিজম্ বা ডিটারমিনিস্ট ল — যাই বলি না কেন — তাও বিজ্ঞানে বহু পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং, এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ থাকতে পারে না। তাহলে, এ সম্পর্কে সঠিক এবং বৈজ্ঞানিক ধারণা কী হবে? এই ক্লাসে অনেকেই আছেন যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র। আমি জানি এবং ধরে নিতে পারি যে, বিজ্ঞানের এইসব বিষয় সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত। এমনকী এইসব বিষয়ের মধ্যে যে টেকনিক্যাল বা ম্যাথামেটিক্যাল দিক আছে সেসবও তাঁরা জানেন। কিন্তু, সকলের বোঝবার সুবিধার জন্য আমি এই বিষয়টিকে যেমন করে বুঝেছি তার মূল বা 'এসেন্স'কে সামনে রেখেই খানিকটা আলোচনা করতে চাই। একটা অত্যন্ত সাধারণ বা সহজ উদাহরণের সাহায্যেই আমি বিষয়টাকে বোঝাবার চেষ্টা করব।

ধরুন, বস্তুর মধ্যে, এমনকী তার যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা আছে সেখানেও, অর্থাৎ, সেই ধরনের 'ফিল্ড'-এও প্রতি মুহূর্তে নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এখন, কোন একটি জিনিসের আমরা নাম দিচ্ছি A। নানা ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তনের পথে এই A নামক পদার্থটি B হতে পারে, C হতে পারে, D হতে পারে — বা অন্য যে কোন একটি পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। এখানে সমস্যাটা হচ্ছে যে, পরিবর্তনটা শেষ পর্যন্ত কী হবে সেটা আগে থেকে বলা যাচ্ছে না, অন্তত পরিবর্তন সম্পূর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়। এটা এজন্য বলা সম্ভব নয় যে, বহু ফ্যাক্টর বা ঘটনা একইসঙ্গে এই পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রকৃতিও অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সেই সূক্ষ্ম পরিবর্তনও ঘটে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। এসব ক্ষেত্রে মুহূর্তের ধারণাটাও বড় অদ্ভুত। বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে, একটি সেকেন্ডকে শত-সহস্র ভাগে ভাগ করা যায় এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষায় সেইভাবে ভাগ করাও হয়। সুতরাং আমাদের জীবনে সাধারণভাবে মুহূর্তের যে ধারণা — এই সমস্ত ক্ষেত্রে মুহূর্তের ধারণাটা সেরকম নয়।

তাই, পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে বহু ফ্যাক্টর কাজ করছে বলে এবং ইলেকট্রন বা মাইক্রোপার্টিক্ল্ যেহেতু প্রচণ্ড গতিশীল, তাছাড়া মুহূর্তের ধারণাও যেখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সেখানে সমস্ত কিছু ফ্যাক্টরকে অ্যাকাউন্ট-এ নিয়ে, অর্থাৎ হিসেবের মধ্যে ধরে, তবে প্রোবেবিলিটি ইকুয়েশন-এর সাহায্যে পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে হচ্ছে। কিন্তু, একথার মানে এরকম হতে পারে না যে, এর দ্বারা ডিটারমিনিজম্কে বিরোধিতা করা হচ্ছে। বিষয়টা ঠিক সেরকম নয়। কেননা ধরুন, যাকে আমরা A বললাম, সেই A নামক পদার্থটা পরিবর্তনের ফলে B, অথবা C, অথবা D অথবা অন্যকিছু যাই হোক না কেন — আমাদের একটা কথা বুঝে নিতে হবে যে, শেষপর্যন্ত যখন এই পরিবর্তনটা ঘটছে, সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্‌ডিটারমিনিজম্ কাজ করছে না, ডিটারমিনিজম্-এর পথ বেয়েই এই পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। অর্থাৎ, A নামক পদার্থটি B হবে, কী C হবে, বা কী হবে, সেটা আগে থেকে বলা সম্ভব না হলেও যখন পরিবর্তন হচ্ছে, অর্থাৎ, পরিবর্তনের পথ বেয়ে A হয় B হচ্ছে, না হয় C হচ্ছে, বা এরকম কিছু হচ্ছে সেই প্রক্রিয়াটা নিয়ম মেনেই ঘটছে — বে-নিয়মে কিছু হচ্ছে না। সেই কারণেই বলছি যে, সেই পরিবর্তনটা ডিটারমিনিজম্ মেনেই হচ্ছে, তাকে বিরোধিতা করে নয়। এই প্রোবেবিলিটি থিওরি-র সাথে ডিটারমিনিজম্-এর কোন সংঘাত আছে বলে আমার মনে হয়নি। তাই বলছি, প্রোবেবিলিটি যেমন সায়েন্স এবং সেই কারণেই একে অস্বীকার করা চলে না, আবার ডিটারমিনিজম্, কজ্ অ্যান্ড এফেক্ট রিলেশনশিপ বা ল অভ কজালিটি, যে ভাষাতেই বলি না কেন, সেটাও বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং বিজ্ঞানকে গ্রহণ করলে এর নড়চড় হবার কোন উপায় নেই। অবশ্য যাঁরা না বুঝে ডিটারমিনিজম্কে প্রিডিটারমিনিজম্-এর সাথে, অর্থাৎ, পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত বা ভাগ্যের সাথে গুলিয়ে ফেলেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কেননা, বিজ্ঞানকে গ্রহণ করলে এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত হলে সেখানে ভাগ্যের কোন স্থান নেই।

সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করার গুরুত্ব

এই ক্লাসে একটা প্রশ্ন এসেছে যে, যেসব বিষয় কমরেডরা ঠিক বলে বুঝতে পারছেন সেইসব বিষয়গুলো যাঁরা চিন্তাশীল মানুষ — বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক — তাঁরা বুঝতে পারেন না কেন? প্রশ্নটি এসেছে বলেই এ সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও দু-চার কথা বলে যাই। আপনারা মার্কসবাদ এবং বিজ্ঞানের আলোচনায়

বিচারপদ্ধতির কথা শুনেছেন। এই বিচারপদ্ধতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষ যতবড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকই হোন না কেন, সমস্যা বিচারের ক্ষেত্রে যে বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি সমস্যাটা বিচার করেন তা যদি কোথাও ভুল হয়, তাহলে তার সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবীরূপে ভুল হতে বাধ্য। সবকিছুকে যদি আমরা পারিপার্শ্বিকের সাথে, বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে মিলিয়ে বিচার না করি, যাকে দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি বলি, তাহলে একই তথ্য বা মেটেরিয়াল থেকে শুরু করেও আমরা ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাব। এই কারণে process of thinking, process of study, process of formation of the working class party, বা যেকোন বিষয়কে বিচার করার পদ্ধতির ওপর আমাদের দল এতটা গুরুত্ব অরোপ করে।

এই বিচারপদ্ধতির বিষয়টি আর একটু গভীরভাবে ভাবা দরকার। চিন্তাপদ্ধতির একটা দিক আছে যাকে 'ব্রড্‌লি' বা মোটা অর্থে দু'ভাগে ভাগ করা যায় — একটা 'ফর্মাল প্রসেস অভ থিংকিং', আর একটা 'ডায়ালেকটিক্যাল প্রসেস অভ থিংকিং'। এই যে বিচারপদ্ধতিকে দুটো ভাগে ভাগ করা হ'ল, যার ওপর আজ ভাববাদী ও অন্যান্য বস্তুবাদী দর্শনের সাথে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের বিচারপদ্ধতির পার্থক্য নির্ভর করছে — এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু, এর পরেও দৈনন্দিন এবং প্রতি মুহূর্তের কার্যকলাপের পদ্ধতির প্রশ্নটিও অত্যন্ত জরুরি। যেমন ধরুন, আমরা যারা মার্কসবাদে বিশ্বাসী বা আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর যাঁরা অনুগামী, তাদের সকলের বিচারের ধারা বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে একটা মিল বা সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, শুধু এইটুকু হলেই চলে না। তারপরেও আমাদের যেটা দেখা দরকার, তা হচ্ছে, আমাদের চিন্তা, আমাদের বিচার, পড়াশুনা, আলোচনা, দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম সবকিছু আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বান্দ্বিকপদ্ধতিতে পরিচালনা করতে পারছি কিনা। এই বিষয়গুলিকে প্রতিমুহূর্তে এবং বিশদভাবে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার। কেননা, মোটা অর্থে বিচারপদ্ধতিতে ঐক্য থাকলেও নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যেকোন বিষয়ের খুঁটিনাটি দিকগুলোর ক্ষেত্রেও আমাদের চিন্তা ও বিচারপদ্ধতি প্রতিমুহূর্তে সঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে কিনা — এব্যাপারে 'ভিজিলেন্স' বা সজাগতার অভাব ঘটলে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য ঘটে যেতে পারে। তাই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বা 'সায়েন্টিফিক বেন্ট অভ মাইন্ড' — অর্থাৎ, জীবনে সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারা নিয়ে চলা, তাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা, আবার প্রয়োগ করাটাও সঠিক হ'ল কিনা তাকে ঠিকমত বুঝে নেওয়া — এই সবকিছুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ, অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে, অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এই 'সিস্টেম অভ থট' নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। অবশ্য আমরা জানি যে, একজন বৈজ্ঞানিক যদি বিজ্ঞানসাধনায় সফল হতে চান তাহলে একটা বৈজ্ঞানিক মন এবং 'এথিকস অভ সায়েন্স' দ্বারা তাঁকে পরিচালিত হতেই হবে। ফলে, তাঁরা যখন পরীক্ষাগারে গবেষণা করেন তখন তাঁরা নিজেরা ভাববাদী হলেও সেই চিন্তা তাঁদের গবেষণাকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু যখন তাঁরা পরীক্ষাগারের বাইরে এসে নানা বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন, এমনকী তাঁদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাখ্যা করতে যান, তখন সেই ব্যাখ্যা অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের দার্শনিক চিন্তার — এক্ষেত্রে ভাববাদী চিন্তার — দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এই ধরনের বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় এইখানে। তাই এইসব দিকগুলোকেও আমাদের খেয়ালে রাখা দরকার।

অ্যাকসিডেন্ট ও অ্যাকসিডেন্টাল কোয়েনসিডেন্স

আমরা কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছি যে, প্রিডিটারমিনিজম্ বা ভাগ্য বলে কিছু নেই। এই আলোচনাকে ভিত্তি করে এই ক্লাসে একটা প্রশ্ন এসেছে। প্রশ্নটা হল, ভাগ্য বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে অ্যাকসিডেন্ট হয় কী করে, বা অ্যাকসিডেন্টে মানুষ মারা যায় কী করে? অনেকে মনে করেন, এটা কি পূর্বনির্ধারিত নয়? আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি যে, মানুষের মধ্যে এই ধরনের প্রশ্নগুলো বার বার ঘুরে ফিরে আসে। সেইজন্যই বিষয়টা একটু আলোচনা হওয়া দরকার। আমরা আগেই দেখেছি যে, দুনিয়ার সমস্ত পরিবর্তনই নিয়ম মেনে চলে, প্রতিটি ঘটনা ল গভার্নড। দুনিয়াতে এমন কোন ঘটনা ঘটতে পারে না, যা নাকি নিয়মের বাইরে। ফলে অ্যাকসিডেন্ট যখন ঘটে তখনও ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে, সেটা ছিল পূর্বনির্ধারিত। বিষয়টা ঠিক তা নয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি আমরা বিচার করি, তাহলে বিষয়টাকে আমাদের 'অ্যাকসিডেন্টাল কোয়েনসিডেন্স' হিসেবেই বুঝতে হবে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা খানিকটা পরিষ্কার

হতে পারে। ধরে নিন, কোন একজন ব্যক্তি তার প্রিয়জনের অসুস্থতার জন্য খুব উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত অবস্থায় ছুটে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে, অথবা ওষুধ কিনতে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে উল্টোদিক থেকে আবার একদল ডাকাত ডাকাতি করে লুটের মাল নিয়ে গাড়ি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। এখানে যে মানুষটি ওষুধ কিনতে যাচ্ছে — তার দ্রুত ছোটার এবং অন্যমনস্ক হবার একটা কারণ আছে। আবার যারা লুটের মাল নিয়ে ছুটছে তাদেরও ঐভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার একটা কারণ আছে। কিন্তু, একথা পরিষ্কার যে, এই দু'টি ঘটনা ভিন্ন এবং এই দুইয়ের দ্রুতগতিতে যাবার কারণও ভিন্ন — এদের পরস্পরের কার্যকারণের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই দুইয়ের যোগাযোগ ঘটে গেল একটি স্পট্-এ একটি মুহূর্তে। একটি বিশেষ স্থানে এদের সংঘর্ষ ঘটে গেল। অর্থাৎ, এরা একে অপরের সঙ্গে অ্যাকসিডেন্টালি কোয়েনসাইড করল বা অ্যাকসিডেন্টালি মিট করল। ফলে, মানুষটির মৃত্যু ঘটল। এর মধ্যে প্রিডিটারমিনিজম্ বা পূর্বনির্ধারিত কোন কিছু আছে, বা ভাগ্যের প্রশ্ন আসে কী করে? যদি এদের গতি মুহূর্তের জন্য অদলবদল হত তাহলে ধাক্কা লাগত না এবং মানুষটিরও মৃত্যু ঘটত না। এখন কেউ মনে করতে পারেন, এই যে গতি অদলবদল হল না — এটাই তো পূর্বনির্ধারিত এবং ভাগ্যই এর জন্য দায়ী। নাহলে গতি অদলবদল হল না কেন? আসলে, এভাবে মনে করার কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। এগুলো প্রচলিত নানা কুসংস্কার, সমাজ থেকে আহরিত নানাধরনের অবৈজ্ঞানিক ধারণা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে বলেই — তা যে শুধু আমাদের চিন্তাপদ্ধতিকে প্রভাবিত করে তাই নয় — মনের মধ্যে অনেক কুসংস্কারের জন্ম দেয়। এ ব্যাপারে আমি মনে করি, এইটুকু আলোচনাই যথেষ্ট। এবার অন্যপ্রসঙ্গে আসা যাক।

আনসারটেন্‌টি প্রিন্সিপ্‌ল

আপনারা অনেকেই জানেন যে, বিজ্ঞানের কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে দর্শনগতক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে। এইসব বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব আজও বহু ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে হাইসেনবার্গের 'আনসারটেন্‌টি প্রিন্সিপ্‌ল'-এর প্রশ্নটি সর্বাগ্রে এসে পড়ে। এই আনসারটেন্‌টি প্রিন্সিপ্‌ল-এর মূল বক্তব্যটা কী? বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে, মুভিং ইলেকট্রন বা মাইক্রোপার্টিক্‌ল্-এর অবস্থান (position) এবং ভরবেগ (momentum), অর্থাৎ, ভর × গতিবেগ (mass × velocity) — এই দু'টিকে একইসঙ্গে with exact precision জানা যায় না। এর যেকোন একটিকে যত অ্যাকিউরেটেলি জানবার চেষ্টা করা হবে, অপরটি সম্বন্ধে অ্যাকিউরেটেলি জানা তত বেশি অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এখন, এইসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হাইসেনবার্গের এই আনসারটেন্‌টি প্রিন্সিপ্‌লকে নিয়ে একসময় খুবই হৈ চৈ হয়েছে, বিশেষ করে ভাববাদী বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মহলে। বিষয়টিকে একটু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এ সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তি থাকার কথা নয়। ঘটনাটা এমন নয় যে, মুভিং ইলেকট্রনের অবস্থান বা ভরবেগ কোন অবস্থাতেই আমরা জানতে পারি না, বা অ্যাকিউরেটেলি জানতে পারি না। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, একইসঙ্গে অবস্থান (positon) এবং ভরবেগ (momentum) অ্যাকিউরেটেলি জানতে পারা যায় না। এটাকে ভিত্তি করে অনেকে বলতে শুরু করলেন বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, some factors are indeterminate এবং এইভাবে আনসারটেন্‌টি প্রিন্সিপ্‌লকে ভিত্তি করে একটা অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেন। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার, আমরা যে ফিল্ড নিয়ে আলোচনা করছি সেটা অত্যন্ত 'সেন্‌সিটিভ'। কারণ, বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা নিয়ে এসবের কারবার। ফলে যে পরিস্থিতিতে, এমনকী যে যন্ত্রের সাহায্যে, এইসব পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়, পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলে এসব ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। এমনকী তা জানবার বিষয়কে (object) প্রভাবিত করে। ফলে, এই ধরনের সেন্‌সিটিভ ফিল্ড-এ এরকম ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, আমরা কোন কিছুই জানতে পারছি না তা নয়, অবস্থান ও ভরবেগ এই দুটোকে একইসঙ্গে অ্যাকিউরেটেলি জানতে পারা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা এর বেশি কিছু নয়। তাই একে নিয়ে কোনও ধরনের মিস্টিসিজম্ সৃষ্টি করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যাঁরা এসব কথা বলছেন তাঁদের না জানবার কথা নয় যে, হাইসেনবার্গের এই প্রিন্সিপ্‌লকে 'ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন'-এর সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং, একটা বিষয় বোঝা দরকার যে, কোন নিয়মই যদি কাজ না করে, তাহলে সেই প্রিন্সিপ্‌লকে ম্যাথামেটিক্যাল রিলেশন-এর সাহায্যে প্রকাশ করা কীভাবে সম্ভব? ফলে, এখানে indeterminate factor-এর অর্থে আনসারটেন্‌টির কোন ব্যাপার নেই।[৩] শুধু

বিষয়টাকে এইভাবে দেখতে হবে যে, বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি ঘটবে, বিশেষ করে এই সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকণাকে জানবার মত উপযুক্ত যত সূক্ষ্ম যন্ত্রের আবিষ্কার হবে, তত এইসব বিষয় সম্পর্কে মানুষ আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ ধারণা আয়ত্ত করবে। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এবার আনসারটেন্‌টি প্রিন্সিপ্‌ল এবং ইলেকট্রন-এর গতিবিধি সংক্রান্ত এই আলোচনার পরে 'ম্যাক্রোবডি' সংক্রান্ত একটি দিক আলোচনা করে যাই। এটা দেখা গেছে যে, 'হাইলি সেন্‌সিটিভ' এবং 'প্রিসিশন ইনস্ট্রুমেন্ট'-এ কোন ম্যাক্রোবডির মাইক্রোকোয়ান্টিটিকে দু'বার পরিমাপ করলে একই অ্যাকিউরেট রেজাল্ট পাওয়া যায় না। এটা কেন ঘটে? এর কারণ হচ্ছে, যে বস্তু পরিমাপ করা হচ্ছে এবং যা দিয়ে পরিমাপ করা হচ্ছে, খুব সূক্ষ্ম বা infinitesimally minute হলেও, এই দুইয়ের মধ্যেই পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে ঘটছে। এর ফলে একই বস্তু দু'বার ওজন করলে সূক্ষ্ম বিচারে এক রেজাল্ট পাওয়া যায় না। সাধারণ কাজে যখন আমরা বিভিন্ন জিনিস ওজন করি, তখন এসব কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। সমস্যা হয় সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষেত্রে।[৪]

বস্তু গতিশীল ও দ্বান্দ্বিক — অপরিবর্তনীয় বা শাশ্বত নয়

বস্তুসংক্রান্ত বিচারের কিছু কিছু বিষয় যতটুকু আলোচনা হ'ল সেগুলোকে সামনে রেখে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সিদ্ধান্তগুলোকে একটু পর্যালোচনা করলে আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে কীভাবে নিত্যনতুনভাবে 'কনফার্ম' ও সমৃদ্ধ করেছে। আমরা জেনেছি, আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, বস্তু জড় বস্তু তো নয়ই, বস্তু হচ্ছে গতিশীল বস্তু, 'ডায়নামিক ম্যাটার'। আবার এই বস্তু শুধু ডায়নামিক নয়, বস্তু হল দ্বান্দ্বিক বস্তু, ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটার। বস্তু দ্বান্দ্বিক বস্তু বলেই বস্তু গতিশীল, অর্থাৎ, ডায়নামিক। সুতরাং বস্তুর গতিশীলতার কারণ আজ আর কারও অজানা নয়। শুধু তাই নয়, গতিকে বস্তুর বাইরের গুণ হিসেবে ধরা হয় না — বস্তুর ভেতরকার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই বস্তুকে গতিশীল করে তুলেছে। যাই হোক, এখন প্রশ্ন এসেছে, আমাদের যে দর্শন সেটা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন কেন? অর্থাৎ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ — এই কথাটার সঠিক তাৎপর্য কী? প্রথমত আমরা আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণাই অর্জন করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, বস্তুনিরপেক্ষ কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই। এমনকী মানুষের যে মন সেটাও বস্তুরই ক্রিয়ার ফল। এ ব্যাপারে অত্যন্ত সংক্ষেপে মূল বিষয়টা আমি আলোচনা করলেও, এ ব্যাপারে প্যাভলভ্‌-এর বক্তব্য বা আধুনিক বিজ্ঞানের 'ব্রেন ফিজিওলজি' সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করে এই ক্লাসে আলোচনা আমি করিনি। অন্যত্র এই আলোচনা আমি করেছি। এখানে আর এ সম্পর্কে সময়ের অভাবে বিশদ আলোচনায় যেতে পারব না। এখন, আমি যেটা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, বিজ্ঞান থেকে আমরা পেয়েছি যে, বস্তু থেকেই বস্তু হচ্ছে — তাকে সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংস করারও কোন প্রশ্ন নেই। তার ক্ষয় নেই, লয় নেই। যদিও বিশেষ বস্তুর সৃষ্টি আছে, লয় আছে। আজ যে বস্তু সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি না ভবিষ্যতে তাকে জানছি, জানতে পারছি। আসলে বস্তুকে জানা বোঝাই হল বিজ্ঞানসাধনার বা জ্ঞানসাধনার মস্ত বড় কাজ। আমরা একথাও জানতে পেরেছি যে, 'আউট অফ নাথিং' কোন বস্তুকে সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু তাই বলে বস্তুকে অ্যাব্‌সলিউট বা 'ইটার্নাল্‌' বলা চলে না। বস্তুকে অ্যাব্‌সলিউট, অপরিবর্তনীয় বা শাশ্বত বলা ভুল। কেননা, বস্তু নিজেই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সেজন্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাকে বিশ্বজনীন বা ইউনিভার্সাল বলাই যুক্তিযুক্ত। এ ব্যাপারে লেনিন একটি সুন্দর কথা বলেছেন, অর্থাৎ, সুন্দরভাবে 'এক্সপ্রেস' করেছেন। তিনি বলেছেন, matter is a philosophical category। বস্তু হ'ল মৌলিক এক দার্শনিক ধারণা। অর্থাৎ, বস্তু সংক্রান্ত আমাদের ধারণা হ'ল এইরকম যে, বস্তুনিরপেক্ষ বা বস্তুর বাইরে কিছু অবস্থান করে না, শুধু তাই নয় আমরা অতীত বা ভবিষ্যৎ যেদিকে তাকাই না কেন সেখানে বস্তু ছাড়া, অর্থাৎ বস্তুবহির্ভূত কিছু পাবার উপায় নেই। এমনকী মানুষের যে চিন্তা সেটাও বস্তুর ক্রিয়ার ফল, 'প্রোডাক্ট অফ ম্যাটার'। আমরা জানি, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটছে এবং ঘটবে তাকে ব্যাখ্যা করে দর্শন। একথাও ঠিক যে, তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার হচ্ছে বিজ্ঞান, তার তত্ত্ব যোগাচ্ছে দর্শন। আর, এই যে দর্শন তার মূল আধার হচ্ছে বস্তুগত। এটাকেই কখনও কখনও অন্য ভাষায় বলা হয় — essence of thing is matter। সুতরাং যেহেতু সবকিছুই বস্তুময়, বস্তুনিরপেক্ষ কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই দুনিয়াতে, সেই কারণেই আমাদের দর্শন হল বস্তুবাদ। এটা হ'ল একটা দিক।

আমাদের বস্তুবাদ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কেন

এরপরে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, আমাদের দর্শন, যাকে আমরা বস্তুবাদ বলছি, তাকে দ্বন্দ্বমূলক বলা হয় কেন? আমরা আগেই আলোচনা করে দেখেছি যে, আধুনিক বিজ্ঞান তথা 'মডার্ন ফিজিক্স'-এর নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আমরা জেনেছি যে, বস্তু হ'ল গতিশীল বস্তু, বস্তু দ্বন্দ্ব-সমন্বয় দিয়েই পরিবর্তিত হয় এবং এই বস্তু হ'ল বিশ্বজনীন বা ইউনিভার্সাল। আর, বস্তুর চরিত্র যেখানে দ্বান্দ্বিক — নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে — সুতরাং বস্তুর দ্বন্দ্বটাও বিশ্বজনীন। আর, যেহেতু বস্তুর এই দ্বান্দ্বিক চরিত্রের প্রতিফলন ঘটছে চিন্তায়, আদর্শে, দর্শনে — সেজন্য আমাদের দর্শনকেও বলা হয় দ্বন্দ্বমূলক। এই কারণেই আমাদের দর্শন শুধু বস্তুবাদ নয়, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। তাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিচারপদ্ধতির সাহায্যেই আমরা সত্য জানতে পারি, অবশ্য যদি এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিচারপদ্ধতি উপলব্ধি ও প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোন ভুল বা বিচ্যুতি না ঘটে।

বস্তুসংক্রান্ত অন্য দু'একটি দিক বলা দরকার বলে মনে করি। একটা হ'ল সামগ্রিক অর্থে বস্তুধারণা — যে ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, এই বস্তু বিশ্বজনীন, কিন্তু অ্যাব্সলিউট বা অপরিবর্তনীয় নয়। কিন্তু আলাদা করে যখন বিচার করি তখন বস্তুকে বিশেষ বস্তু হিসেবে বুঝতে হবে। যেমন ধরুন, ইলেকট্রন, প্রোটন, বা এই চেয়ার, টেবিল, গ্লাস, বা অন্যকিছু যাই বলি — এই বস্তু বিশেষ বস্তু, বিশেষ তার অবস্থান। কিন্তু, কোন বিশেষ বস্তুর দ্বারাই দুনিয়ার সবকিছু তৈরি হয়েছে — ব্যাপারটা সেরকম নয়। তাকে বিশেষ অবস্থানের মধ্যেই, অন্যান্য বস্তুর সাথে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যেই জানতে ও বুঝতে হবে। তাই বস্তুধারণা নির্বিশেষ বা অ্যাব্সলিউট হতে পারে না।

অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব

একথা আজ প্রমাণিত যে, সমস্ত বস্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত — দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যেই সম্পর্কযুক্ত। আগেই বলেছি, এই দ্বন্দ্ব দুই প্রকার — অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, ভেতরের দ্বন্দ্ব ও বাইরের দ্বন্দ্ব। যেকোন বস্তুর নিজের অভ্যন্তরে যে দ্বন্দ্ব সেটা হল 'ইন্টারনাল কন্ট্রাডিক্শন' বা অন্তর্দ্বন্দ্ব, আবার একটা বস্তুর সঙ্গে অপর একটা বস্তুর যে দ্বন্দ্ব সেটাকে বলা হয় 'এক্সটারনাল কন্ট্রাডিক্শন' বা বহির্দ্বন্দ্ব। এখন, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র কী, এটা বোঝা দরকার। প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে, এরা একে অপরকে সাহায্য করে, প্রভাবিত করে — যাকে বলা হয় সাপ্লিমেন্টারি-কমপ্লিমেন্টারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই দুই ধরনের দ্বন্দ্বের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বই হল পরিবর্তনের ভিত্তি। বহির্দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রভাবিত করে ঠিকই, কোন কোন ক্ষেত্রে এই বহির্দ্বন্দ্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমাদের বুঝতে হবে যে, যখন কোন পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তন ঘটতেই পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিপক্কতা লাভ না করে, অর্থাৎ, internal contradiction mature না করে। সুতরাং, যেকোন পরিবর্তন সূচিত হওয়ার ক্ষেত্রে বহির্দ্বন্দ্ব যত প্রভাবই বিস্তার করুক না কেন, বা যত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই নিক না কেন, বিষয়টিকে এইভাবে বুঝতে হবে যে, অন্তর্দ্বন্দ্বই হ'ল পরিবর্তনের মূল কারণ। তাই basis of change is internal contradiction — যেহেতু পরিবর্তনের উপযোগী বা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত পরিবর্তনটা ঘটাই সম্ভব নয়।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে। উদাহরণটা অবশ্য অত্যন্ত সাধারণ। যেমন ধরুন, কারবাইড গ্যাস। আমরা জানি যে, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে এবং সেই জ্বলন্ত কাঠিটা কারবাইড গ্যাস-এর সংস্পর্শে নিয়ে এলেই গ্যাসটা জ্বলে। এটা দেখে অনেকে মনে করতে পারেন যে, জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটাই গ্যাসে আগুন ধরার মূল কারণ। কেননা, তাঁরা বিষয়টিকে এইভাবেই বোঝেন যে, বাইরে থেকে আগুনটা লাগানো হল বলেই গ্যাসে আগুন ধরল। একথা ঠিক যে, এক্ষেত্রে আগুনের সংস্পর্শে না এলে গ্যাস জ্বলত না। কিন্তু এই দেশলাইয়ের আগুন যদি চুন, বালি, সুরকি — এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় — তার সংস্পর্শে আসত, তাহলে আগুন ধরত কি? এটা সকলেই বোঝেন যে, এক্ষেত্রে আগুন ধরার কোন প্রশ্নই আসে না। জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠির সংস্পর্শে এলে এগুলো জ্বলে উঠত না। এই কারণে জ্বলত না যে, জিনিসগুলোর নিজস্ব ধর্ম বা গুণাবলী এমন নয় যাতে দেশলাইয়ের আগুনের সংস্পর্শে এগুলো জ্বলতে পারে। অর্থাৎ, এইসব জিনিসগুলোর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বা দ্বন্দ্ব যাই বলি না কেন সেটা এমন অবস্থায় পৌঁছায়নি যাতে দেশলাইয়ের কাঠির আগুনে এগুলো জ্বলতে পারে। কিন্তু কারবাইড গ্যাস জ্বলল এজন্য যে,

তার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে জ্বলবার মত অবস্থায় পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে দেশলাইয়ের আগুনের সংস্পর্শ তাকে সাহায্য করল।

এবার সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে বিষয়টিকে আলোচনা করে দেখা যাক। অর্থাৎ, এই তত্ত্বটিকে ভাল করে বুঝলে দর্শনগত দিক থেকে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে, এই কারণেই কোন একটি দেশে বিপ্লব আমদানি বা রপ্তানি করা যায় না। বাইরের শক্তি বিপ্লবকে সাহায্য করতে পারে এবং কখনও কখনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু কোন দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যদি তৈরি না হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দেশের বেশিরভাগ মানুষ বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের কোন শক্তির সাহায্যে কোন দেশে বিপ্লব হতে পারে না। এজন্যই মার্কসবাদীরা বলেন এবং বিশ্বাস করেন যে, revolution can neither be imported nor exported — অর্থাৎ, বিপ্লব আমদানি বা রপ্তানি করা যায় না। বাইরের বিপ্লবী শক্তি অন্য দেশের বিপ্লবকে সাহায্য করতে পারে না তা নয়, কিন্তু, সেই সাহায্য তখনই কার্যকরী হয়, সফল পরিণতিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়, যখন অনুকূল আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। তা নাহলে হয় না।

মূল বা প্রধান দ্বন্দ্বের ভূমিকা

দ্বন্দ্বতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানের আরও দু'একটি দিক এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে যেমন, সমাজ অভ্যন্তরেও তেমনি বহু শক্তির সমাবেশ ঘটে এবং তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলতে থাকে। অর্থাৎ, বাস্তব হল এই যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বহু ধরনের শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সমন্বয় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। সমাজকাঠামোর অভ্যন্তরে অর্থনীতি, নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয় ঐতিহ্য, অন্ধ মানসিকতা, ব্যক্তিস্বার্থ, রাজনীতি, জাতপাত, আচার-বিচার — এরকম কত শক্তিকে কেন্দ্র করে যে নিয়ত এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ঘটে চলেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কিন্তু, এই সমস্ত দ্বন্দ্বগুলোই মূল দ্বন্দ্ব নয়। সমাজ অভ্যন্তরে বহু দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা বিশেষ দ্বন্দ্ব থাকে যেটাকে বলা হয় 'প্রিন্সিপ্যাল কন্ট্রাডিকশন' বা মূল দ্বন্দ্ব। সমাজ-কাঠামোর অভ্যন্তরে এই প্রধান দ্বন্দ্বের ধারণাটা হচ্ছে এইরকম যে, এই প্রধান বা মূল দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য সমস্ত দ্বন্দ্ব আবর্তিত হয়। প্রশ্ন হ'ল, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই প্রধান দ্বন্দ্ব কোনটি? শ্রম ও পুঁজির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল-এর যে দ্বন্দ্ব সেটাই হল পুঁজিবাদী সমাজের প্রিন্সিপ্যাল কন্ট্রাডিকশন বা মূল দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্বই মূল দ্বন্দ্ব। তাদের চিন্তা, দর্শন, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থ সমস্ত কিছুই পরস্পরবিরোধী। মালিকের স্বার্থ এই সমাজকে টিকিয়ে রাখা, আর শ্রমিকের স্বার্থ তাকে ভাঙা। এই যে মূল দ্বন্দ্ব এটাই সমাজের পরিবর্তনকে মৌলিকভাবে প্রভাবিত করে। সমাজ-অভ্যন্তরে এই মূল দ্বন্দ্ব সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকেও প্রভাবিত করে। এই প্রভাব দু'দিক থেকেই বর্তায়। কারও ক্ষেত্রে এই সমাজকে টিকিয়ে রাখার দিক থেকেই প্রভাব কাজ করে। আবার কারও ক্ষেত্রে এই প্রভাব প্রচলিত সমাজকে ভাঙবার শক্তিকেই জোরদার করে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেই চিন্তার ব্যক্তিকরণ বা 'পারসনিফিকেশন' ঘটে। তাই বিপ্লবী হওয়া মানে হল, এক অর্থে সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বকে সচেতনভাবে বোঝা ও সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করা। অর্থাৎ, কন্ট্রাডিকশন-এর নেচারকে 'কনসাস্‌লি আন্ডারস্ট্যান্ড' করা এবং সমাজপ্রগতির প্রক্রিয়াতে 'কনসাস্‌লি রিঅ্যাক্ট' করা।

এখন, শ্রম ও পুঁজিকে যখন আলাদা করে বিচার করা হয় তখন দেখা যায় যে, এই শক্তিগুলির প্রত্যেকের নিজের মধ্যে আবার নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব অবস্থান করে। সেগুলোকেও বিশেষভাবে লক্ষ ও পর্যালোচনা করতে হয়। একে বলা হয় contradiction within contradiction, অর্থাৎ, দ্বন্দ্বের ভিতরে দ্বন্দ্ব। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একথা ভুললে চলবে না যে, এই সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বই হচ্ছে মূল দ্বন্দ্ব। আগেই বলেছি, পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি বা বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা হচ্ছে এই সমাজকাঠামোকে রক্ষা করা। আবার, শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা হচ্ছে এই সমাজকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন করা। তাই সমাজপ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হ'ল, এই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী শক্তিকেই জোরদার করা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মতবাদিক বা সাংগঠনিক সমস্ত দিককে যুক্ত করেই এই প্রচেষ্টাকে জোরদার করা প্রয়োজন। সুতরাং, পুঁজিবাদী সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে তোলা ততদিন সম্ভব নয় যতদিন না এই মূল দ্বন্দ্বকে উপযুক্তভাবে প্রভাবিত বা তীব্র করে পরিবর্তনকে সূচিত করা যায়।

বিরোধাত্মক ও মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব

এরপর বিরোধাত্মক ও মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোচনা এখানে শেষ করব। বিভিন্ন ধরনের এই দ্বন্দ্বকে কখনও কখনও আর একভাবে বিচার করা হয়। সেই বিচারে এক ধরনের দ্বন্দ্বকে বলা হয় বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব (antagonistic contradiction), আর এক ধরনের দ্বন্দ্বকে বলা হয় মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব (non-antagonistic contradiction)। একটু আগে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রম ও পুঁজির যে দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই দ্বন্দ্বকে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব বলা হয়। এই দ্বন্দ্বের চরিত্র হচ্ছে একে অপরকে উচ্ছেদ করার দ্বন্দ্ব। সামাজিক পটভূমিতে বিচার করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে, যে পুঁজিপতিশ্রেণীর লক্ষ্য হচ্ছে শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা, সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে-ওঠা সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্য অর্জন করার মধ্য দিয়েই এই বিরোধাত্মক সংগ্রামের সঠিক সমাধান (resolution) হতে পারে। এই দ্বন্দ্ব যখন চলতে থাকে তখন এই দুইয়ের মধ্যে সাময়িক মিলন ঘটে না তা নয়। কিন্তু, সেটাও ঘটে পুঁজিপতিশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর অধিকতর শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। এই কারণেই এই ধরনের দ্বন্দ্বকে বলা হয় বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব (antagonistic contradiction)। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি মূল নীতি (three principles) আলোচনার সময় এই বিষয় সম্পর্কে আর একটু ব্যাখ্যা করে দেখাবার চেষ্টা করব।

তাহলে মিলনাত্মক দ্বন্দ্বের চরিত্র কী? মিলনাত্মক দ্বন্দ্বের চরিত্র বা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শেষপর্যন্ত ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্য একে অপরের সাথে মিলনের জন্য লড়াই। এ সম্পর্কে আমি একটি উদাহরণ তুলে ধরব। ধরুন, আমাদের দলে বা কোন একটি শ্রমিকশ্রেণীর দলে নেতা থেকে কর্মী পর্যন্ত সকলেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকেই একমাত্র সঠিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন বলে মনে করেন। ভারতবর্ষই বলুন বা অন্য যেকোন দেশই বলুন, একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের সদস্যদের সেই দেশের বিশেষ বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে ঐকমত্যের ভিত্তিতেই প্রতিদিনের কাজকর্ম পরিচালনা করতে হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আপনারা সকলেই জানেন যে, সংগ্রাম পরিচালনার সমস্ত স্তরে বা প্রতিটি রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত নানা ধরনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দলের অভ্যন্তরে নেতা ও কর্মীদের উপলব্ধির তারতম্য বা অভিজ্ঞতার পার্থক্যের দরুন পরস্পর মতবিরোধ বা দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। মূল দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সকলে একমত হলেও পরস্পরের মধ্যে এ ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যারা এই ধরনের দ্বন্দ্বে প্রতিমুহূর্তে লিপ্ত তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কোনমতেই বৈরিতা বা বিদ্বেষমূলক মনোভাব থেকে উদ্ভূত নয়। সংঘর্ষের তীব্রতা যত বেশিই হোক না কেন এই দ্বন্দ্ব নিজেদের মধ্যে বৈরিভাব সৃষ্টি করে না। এই দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরস্পর চিন্তাগত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কোন বিষয় সম্পর্কে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্যে প্রয়োগ করে শুধু দলকে আরও শক্তিশালী করাই নয়, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ককেও আরও সুদৃঢ় (cement) করা। গোটা দলের পরিপ্রেক্ষিতে যখন বিচার করা হয় তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দলের ঐক্যকে বিনষ্ট করা নয়, বরং তাকে আরও সুদৃঢ় করাই এই দ্বন্দ্বের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই কারণেই এই ধরনের দ্বন্দ্বকে বলা হয় মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব।

কমরেডস্, তাহলে এ কয়দিনের আলোচনায় বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা বিষয় সম্পর্কে আপনারা শুনলেন। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বস্তু সংক্রান্ত ধারণাটা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, কী তার রূপ, সে সম্পর্কেও অন্যান্য নানা বিষয় আলোচনার সাথে সাথে একটা মোটামুটি ধারণা আপনারা পেলেন। আপনারা জেনেছেন যে, বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল। বস্তুর গতির কারণ বস্তুর বাইরে অবস্থান করে না, বরং গতি বস্তুরই নিজস্ব ধর্ম (property) এবং বস্তুর ভেতরের ও বাইরের দ্বন্দ্ব মিলেই বস্তুকে গতিশীল করেছে। আর, এই কারণেই বস্তুর গতিকে বলা হয় mode of existence of matter — যার মূল কথা হচ্ছে, গতি ছাড়া কোন বস্তু অবস্থান করে না। এখন, এই যে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে দুনিয়াতে, বস্তুর এক কাঠামো থেকে আর এক কাঠামোতে রূপান্তর ঘটছে, এই পরিবর্তন বস্তুজগতের ক্ষেত্রেই বলি, সমাজের ক্ষেত্রেই বলি, বা যেকোন ক্ষেত্রেই বলি — পরিবর্তন যখন সাধিত হচ্ছে তখন সেই পরিবর্তনও বেনিয়মে হচ্ছে না, তা নিয়ম মেনেই পরিচালিত হচ্ছে। আপনাদের বোঝা দরকার যে, কোন পরিবর্তনই নিয়ম ছাড়া, কার্যকারণ-সম্পর্ক ছাড়া ঘটতে পারে না। তাই জ্ঞান অর্জনের মানে হ'ল পরিবর্তনের নিয়মকে জানা এবং সেই নিয়মের

পথ বেয়ে পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা। এই নিয়মকে না জানলে এবং তার ওপর সচেতন ক্রিয়া না ঘটাতে পারলে সমাজপরিবর্তন সম্ভব নয়। অর্থাৎ, আমাদের ইচ্ছামত, নিয়ম না মেনে, আমরা পরিবর্তন ঘটাতে পারি না। তাই পরিবর্তনের নিয়মগুলোকে জানার প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ। আবার, একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই নিয়মও কালক্রমে, একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন পরিস্থিতিতে, নতুন নিয়মের জন্ম দেয়। এখন, দুনিয়াতে সর্বত্র এই যে পরিবর্তনের ধারা চলছে তাকে স্টাডি করে মার্কসবাদী বিজ্ঞান বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে যে, এইসব পরিবর্তনের পেছনে যে সমস্ত নিয়ম কাজ করে তার মধ্যে মূল নিয়ম হচ্ছে তিনটি, অর্থাৎ, পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বত্র তিনটি সাধারণ মূল নিয়ম কাজ করে চলেছে। একেই বলা হয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি মূল নিয়ম বা three principles of dialectics। বস্তু ও সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে যে ধারণা আপনারা পেলেন তারই ভিত্তিতে এই 'থ্রি প্রিন্সিপ্‌লস' সম্পর্কে আমি এখন সংক্ষেপে আলোচনা করে এবারের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করব। এখন দেখা যাক, এই থ্রি প্রিন্সিপ্‌লস কী কী। একটি একটি করে সেই তিনটি মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন ও ভাইসি-ভারসা

From quantitative change to qualiative change and vice-versa

এই থ্রি প্রিন্সিপ্‌লস-এর প্রথম নীতিটি হচ্ছে, পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন ও ভাইসি-ভারসা। এই নীতিটি সম্পর্কে সকলের বোঝবার জন্য প্রথমে আমি বিজ্ঞান থেকে একটি উদাহরণ দিতে চাই। কিন্তু, উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করছি বলে সেগুলোকে আপনারা যান্ত্রিকভাবে ধরে নেবেন না। তাহলে বোঝাটা গোলমাল হয়ে যাবে। উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে শুধু আপনাদের বোঝবার সুবিধার জন্য। আমি আলাদা করে নতুন কোন উদাহরণ এখানে দিচ্ছি না। দু'একটি ছাড়া এইসব উদাহরণ বিভিন্ন 'মার্কসিস্ট অথরিটি'রাও অনেকেই উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র অন্যান্য অথরিটির সাথে আমার বলার পার্থক্য এইটুকু হবে যে, আমি যেমন বুঝেছি আমার ভাষায় আমি তেমনভাবে আপনাদের কাছে রাখবার চেষ্টা করব। আপনারা সকলেই জানেন যে, জলকে যদি ধীরে ধীরে তাপের সাহায্যে গরম করা হয় তাহলে একটা সময়ে এসে যে পরিমাণ জল নিয়ে তাপ দেওয়া শুরু হয়েছিল সেই সমস্ত জলটাই দ্রুত ফুটে বাষ্পে (steam) পরিণত হয়। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, প্রথমদিকে তাপ দেওয়ার ফলে যখন জল গরম হতে শুরু করে তখনই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জলটা বাষ্পে পরিণত হয় না। জল থেকে বাষ্পে পরিবর্তিত হওয়ার মধ্যে যে গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় — মনে রাখতে হবে, এখানে জলের রাসায়নিক গুণের পরিবর্তন ঘটছে না — সেটা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর একটা স্তরে এসে হয়, তার আগে নয়। এখন, কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে তাপ দেওয়া শুরু করার পর প্রথমদিকে কি জলের মধ্যে কোনরকম পরিবর্তন হচ্ছে না? এর উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ হচ্ছে। তখনও জলের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু, তার প্রকৃতি হল মূলত পরিমাণগত পরিবর্তন, অন্য কিছু নয়। পরিমাণগত পরিবর্তন এই অর্থে যে, তাপ দেওয়ার ফলে জলের তাপমাত্রা (temperature) ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, জল ক্রমশ গরম হয় এবং সেই অর্থেই একে পরিমাণগত পরিবর্তন বলা হয়। কিন্তু, দেখা গেল যে, বায়ুর যে সাধারণ চাপ, যাকে 'অ্যাটমসফেরিক প্রেশার' বলা হয়, সেই চাপ যখন একইরকম থাকে তখন ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পৌঁছালেই গোটা জলটাই বাষ্পে পরিণত হয়। সুতরাং, এই যে দ্বিতীয় পরিবর্তনের কথা বলা হয়, অর্থাৎ, জল ফুটে বাষ্পে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হ'ল তাকে বলা হয় গুণগত পরিবর্তন। এই অর্থেই গুণগত পরিবর্তন বলা হয় যে, জল আর তখন তরল রইল না, বাষ্পে পরিণত হ'ল।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, এখানে যে, 'ভাইসি-ভারসা' কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ কী? মনে রাখা দরকার যে, প্রচলিত অর্থে ভাইসি-ভারসা বলতে যা বোঝায় এখানে সেই অর্থে ভাইসি-ভারসা কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে না। অর্থাৎ, ব্যাপারটা এমন নয় যে, ভাইসি-ভারসা বলতে গুণগত পরিবর্তন থেকে আবার পরিমাণগত পরিবর্তনে ফিরে আসা বোঝায়, অর্থাৎ, ঠিক উল্টো প্রক্রিয়া বোঝায়। বিষয়টা মোটেই সেরকম নয়। জল থেকে বাষ্পে পরিবর্তনের যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তাকে সামনে রেখেই এই ভাইসি-ভারসা বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে, ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় না পৌঁছালে পুরো জলটা বাষ্পে পরিণত হতে পারে না। কিন্তু, বিষয়টা এমন নয় যে, পুরো জলটা বাষ্পে

পরিণত হতে না পারলেও জলের কোন অণু (molecule) তার আগে বাষ্পীভূত হয় না, বা হতে পারে না। জলকে যখন গরম করা হয় তখনই গোটা জল ফুটে বাষ্পীভূত না হলেও 'ইনডিভিজ্যুয়াল মলিকিউল', অর্থাৎ, জলের বিশেষ বিশেষ অণু সমগ্র জল ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পৌঁছাবার আগেই বাষ্পীভূত হতে পারে — যেখানে যেখানে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সৃষ্টি হবে। সুতরাং জলের তাপমাত্রা যেমন যেমন বৃদ্ধি পায়, যাকে পরিমাণগত পরিবর্তন বলা হয় — সেই পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই আবার জলের কিছু কিছু অণুর ক্ষেত্রে সমগ্র জল ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পৌঁছানর আগেই গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এটা বিজ্ঞানে স্বীকৃত। আবার, বিশেষ বিশেষ অণুগুলো এইভাবে যেমন যেমন বাষ্পীভূত হয় সেটা আবার জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি তথা পরিমাণগত পরিবর্তনকে দ্রুত করতে সাহায্য করে। এটাকেই ভাইসি-ভারসা বলা হয়।

পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করলে আপনারা বুঝতে পারবেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে সামনে রেখেই বিষয়টা আলোচনা করা যাক এবং এক্ষেত্রে আমাদের দেশ ভারতবর্ষের উদাহরণকে সামনে রেখে আলোচনা করাটাই যুক্তিযুক্ত হবে। আপনারা জানেন, প্রতিদিন কোন না কোন আন্দোলন, নানা সাংগঠনিক কার্যকলাপ, শ্রেণীসংগ্রাম, বিভিন্ন ধরনের লড়াই, আদর্শগত সংগ্রাম প্রভৃতি যেভাবেই হোক দেশের অভ্যন্তরে ঘটে চলেছে। এর ফলে কখনও পুঁজিপতিশ্রেণী শক্তিশালী হচ্ছে, কখনও প্রগতিশীল শক্তি জোরদার হচ্ছে — ক্রমাগত এই উত্থান-পতন চলছে। এই সবকিছুর ফলে মানুষের চিন্তা, আচার-ব্যবহার সবকিছুর ক্ষেত্রেও ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু এই পরিবর্তনটা এমন নয় যে, এর দ্বারাই সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন ধরুন, ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ও এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত ছিল, আবার আজও সেটা পুঁজিবাদই আছে। কিন্তু, এই দুই সময়কার পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য ঘটে গেছে অনেক। একদিকে পুঁজিবাদের সংকট, প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষ, প্রতিযোগিতার রূপ — সবকিছুই অনেক পাল্টে গেছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংকট দেশে তীব্র রূপ ধারণ করেছে, জিনিসপত্রের দাম মারাত্মক হারে বেড়েছে এবং ক্রমাগত বাড়ছে। জীবনধারণের উপায় ও উপাদানগুলো প্রতিদিন পাল্টাচ্ছে, শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও পুঁজিবাদ পুঁজিবাদই আছে। আবার, বুর্জোয়াদের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব বাড়ছে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী অসংগঠিত থাকার ফলে এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে গড়ে না ওঠার ফলে বুর্জোয়াশ্রেণী সেই দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে। সুতরাং, একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, দৈনন্দিন যে পরিবর্তনগুলো ঘটে চলেছে তাতে পুঁজিবাদের মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে না। আবার, মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে না বলে কোন পরিবর্তনই হচ্ছে না, তা নয়। এই প্রতিদিনের পরিবর্তনকেই বলা হয় পরিমাণগত পরিবর্তন। এই পরিমাণগত পরিবর্তনই ক্রমাগত ঘটতে ঘটতে একসময় 'লিড' করে গুণগত পরিবর্তন বা বিপ্লবে, যখন সমাজে চরম বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সমাজ অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব 'ক্লাইম্যাক্স'-এ এসে পৌঁছায়। যেমন, রুশদেশে, অর্থাৎ পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ ভূমিতে ১৯১৭ সালে নভেম্বর মাসে যে প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে গেল, যেখানে রাষ্ট্রকাঠামো থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটল এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল — এই ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় গুণগত পরিবর্তন, হঠাৎ পরিবর্তন, মৌলিক পরিবর্তন, বা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন।

সুতরাং, আপনারা দেখতে পেলেন যে, প্রতিটি জিনিসের মধ্যে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে যে পরিবর্তন ঘটে তাকেই বলা হয় পরিমাণগত পরিবর্তন, ধীরে ধীরে পরিবর্তন ইত্যাদি। কিন্তু এই পরিবর্তন হতে হতে যে মুহূর্তে বা যে সময়ে এসে গোটা জিনিসটার মধ্যেই একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে তাকেই বলা হয় গুণগত পরিবর্তন। আর, মার্কসবাদে একেই বলা হয় পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে গুণগত পরিবর্তন — বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় continuous এবং discontinuous change। সুতরাং সমাজের দ্বন্দ্বের চরিত্র বুঝে যদি আপনারা সচেতনভাবে রিঅ্যাক্ট করতে পারেন তবেই সেটা বিপ্লবী পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

এখন, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভাইসি-ভারসাকে বোঝা যাবে কী করে? এখানেও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে উদাহরণ হিসেবে সামনে রেখেই বিষয়টা আমি আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করব। আপনারা সকলেই শুনেছেন যে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার ফলে এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে না যতক্ষণ না গোটা পরিস্থিতিটা চূড়ান্ত পর্যায়ে বা 'নোডাল পয়েন্ট'-এ পৌঁছায়। এখন, এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যেই যখন শ্রেণীসংগ্রাম এবং

সচেতন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে একজন একজন করে কমিউনিস্ট বিপ্লবী কর্মী তৈরি হয়, সেই মানুষগুলোকে আলাদা করে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, তাদের জীবনের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ, জীবনের উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে।

ধরুন, এই যে আপনারা এই ক্লাসে সাম্যবাদী শিক্ষা নিচ্ছেন, একথার মানে এ নয় যে, সাথে সাথে আপনাদের চরিত্রের গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। একদিকে সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের আন্দোলনগুলোতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা, অন্যদিকে উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির ভিত্তিতে জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে কঠোর ও কঠিন সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির পক্ষে এই সমাজে সত্যিকারের কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরনো জিনিস ঝেঁটিয়ে বিদায় দিতে না পারা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত, আপনারা মনে রাখবেন, কারোর ক্ষেত্রেই সমস্ত দিক থেকে গুণগত পরিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়। আবার, এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলতে চলতেই দেখা যাবে যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে একদিন মূলগত পরিবর্তন ঘটে গিয়ে তারা সত্যিকারের কমিউনিস্ট হয়েছে, যদিও তখনও সমাজব্যবস্থাটা পুঁজিবাদীই রয়ে গেছে। এখানে এই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সমাজের বিশেষ উপাদান বা এলিমেন্ট হিসেবেই ধরতে হবে। সুতরাং, গোটা সামাজিক কাঠামোটা পুঁজিবাদী থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনে গুণগত পরিবর্তন ঘটা সম্ভব এবং ঘটছে। আর, এই ধরনের কমিউনিস্ট চরিত্রের অধিকারী মানুষ সমাজে যত বাড়তে থাকবে, শ্রেণীসংগ্রাম তত ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হবে, বিপ্লবী আন্দোলন জোরদার হবে এবং এটা যত শক্তিশালী হবে ততটা পরিমাণেই পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বাড়াতে বেশি বেশি সাহায্য করবে। এই হল ভাইসি-ভারসার তাৎপর্য।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, পুঁজিবাদী সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটছে, এক এক করে অসংখ্য কমিউনিস্ট কর্মী তৈরি হচ্ছে সেই ধরনের কর্মী তৈরি করা, তাদের কমিউনিস্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়াই শুধু নয়, সেই কমিউনিস্ট চরিত্রকে রক্ষা ও ক্রমাগত উন্নত করার সংগ্রামটা কত জরুরি। অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন নয় যে, একটি পুঁজিবাদী দেশে শ্রেণীসংগ্রামের আঘাতে আপনা-আপনি কমিউনিস্ট কর্মী তৈরি হচ্ছে এবং তারই পরিণতিতে পরিমাণগত পরিবর্তনের পথ বেয়ে আপন নিয়মেই গুণগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ভেঙে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ, সমাজ অভ্যন্তরে সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে প্রতিনিয়ত মহান মার্কসবাদী আদর্শের আধারে সংগ্রাম পরিচালনা না করলে যে সত্যিকারের কমিউনিস্ট হওয়া যায় না এবং আপনা-আপনি দেশে যে বিপ্লব সাধিত হতে পারে না আমি এই দিকটার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাইছি। সেজন্য বলছিলাম যে, ভাইসি-ভারসার গুরুত্ব কতখানি। এই গুরুত্বকে সঠিকভাবে না বুঝলে আমরা 'স্পন্টেনিইটি তত্ত্বের' শিকার হব, যার অর্থ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিটি কমিউনিস্টের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব তার গুরুত্বকেই লঘু করে দেখা হবে।

বিরোধী শক্তির ঐক্য
Unity of opposites

থ্রি প্রিন্সিপ্‌লস-এর দ্বিতীয় নীতিটি হচ্ছে, বিরোধী শক্তির ঐক্য। আপনারা সকলেই জানেন যে, মানুষ মাত্রেই দোষে-গুণে মানুষ। শুধু গুণ আছে, কোন দোষ নেই এরকম মানুষ যেমন পাওয়া সম্ভব নয়, ঠিক তেমনই শুধুই দোষ, কোনও গুণ নেই, এমন মানুষও কেউ খুঁজে পাবেন না, পেতে পারেন না। তাহলে, আমরা যখন কোন মানুষকে বলি ভালো, বা কোন মানুষকে বলি খুব খারাপ — একথাটার অর্থ কী? আপনাদের মনে রাখা দরকার, এখানে ভালো-মন্দের বিচার করা হচ্ছে আপেক্ষিক অর্থে, অর্থাৎ, যে মানুষের মধ্যে দোষের দিকের চাইতে গুণের দিক বেশি, তাকেই আমরা বলি ভালো। আবার, যখন দেখা যায়, কোন একটি মানুষের গুণ নেই তা নয়, কিন্তু তার দোষের দিকটা অনেক বেশি প্রবল, তখন তাকে আমরা বলি মন্দ।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, মানুষের মধ্যে এই পার্থক্যটা ঘটে কেন? এই পার্থক্যটা ঘটে এইজন্য যে, এক একজন মানুষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কি দাঁড়াবে সেটা একান্তভাবে নির্ভর করে তার নিজের ভেতরকার দ্বন্দ্বের ওপর। একথা সকলেই বুঝতে পারেন যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি ও বিবেকের একটা দ্বন্দ্ব বা সংঘাত কাজ করে। এখানে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, কোন মানুষই বিশেষ কোন প্রবৃত্তি বা

বিবেকবোধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না এবং এগুলো অপরিবর্তনীয়ও নয়, বা শাশ্বতও নয়। এখন, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রক্রিয়ায় যে ব্যক্তির প্রবৃত্তি বিবেককে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়, সে হয়ে পড়ে নিছক প্রবৃত্তির দাস। স্বাভাবিকভাবেই সেই মানুষের মধ্যে দোষের দিকটাই বৃদ্ধি পায়, গুণের দিকটা নয়। এই ধরনের মানুষকেই আমরা বলি খারাপ মানুষ। বিপরীত দিক থেকে যে মানুষের বিবেক খুব সচেতন ও সক্রিয়, যে মানুষের বিবেক প্রবৃত্তিকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়, সেই মানুষের গুণের দিকগুলোই বেশি করে বিকশিত হতে থাকে। আর, এই ধরনের মানুষকেই আমরা বলি ভালো মানুষ। অর্থাৎ, প্রবৃত্তি যেক্ষেত্রে জয়ী হয় সে মানুষ হয় ব্যাভিচারী, আবার বিবেক জয়ী হলে মানুষের জীবনের মোড় ঘুরে যায়, সমাজে সে ভালো মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু, একথার মানে এরকম নয় যে, ভালো লোকের মধ্যেও কোন খারাপ বা নীচু প্রবৃত্তি উঁকি মারতে পারে না, বা মন্দ লোকের মধ্যেও কিছু ভালো জিনিস থাকে না — ব্যাপারটা তা নয়।

সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই বিবেক ও প্রবৃত্তির নিয়ত দ্বন্দ্ব-সমন্বয় বিদ্যমান এবং এটাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, একই মানুষের মধ্যে বিবেক ও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিরোধী সত্তা নিয়ে অবস্থান করে এবং এই দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব নিয়েই প্রতিটি মানুষ অবস্থান করছে। আবার, এই দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব আছে, তেমনই তাদের সমন্বয়ও আছে। এই বিরোধী শক্তির মধ্যে ঐক্য আছে বলেই সমাজে আমরা স্বাভাবিক মানুষ দেখতে পাই। প্রবৃত্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্বে এই ঐক্য ও সমন্বয় না ঘটলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, তার মানসিক ভারসাম্যের অভাব ঘটে। অর্থাৎ, একজন ভালো মানুষের মধ্যে যখন নিচু প্রবৃত্তি উঁকি মারে তখন সে বুদ্ধি দিয়ে, সচেতন প্রচেষ্টার সাহায্যে তাকে দমন করে। এর ফলেই মানুষের মনের ভারসাম্য ঠিক থাকে, 'নরম্যাল' বা স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেই মানুষ অবস্থান করে। কিন্তু কোন মানুষ এই বিরোধী শক্তির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হলে একটা প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে সেই মানুষের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, মানসিক দ্বন্দ্বে জেরবার হয়ে একদিন সে হয় পাগল।

সমাজের দিকে লক্ষ করলেও এই বিরোধী শক্তির ঐক্যের নীতিটিকে আপনারা বুঝতে পারবেন। যেমন ধরুন, পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী এই দুই মূল বিরোধী শক্তি একে অপরকে উচ্ছেদ করার জন্য লড়ছে। বুর্জোয়া ও শ্রমিকের এই লড়াইয়ের চরিত্র হচ্ছে একে অপরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা। আপনারা আগেই শুনেছেন যে, এই ধরনের দ্বন্দ্বকেই বলা হয় বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, অ্যান্টাগনিস্টিক কনট্রাডিকশন। স্বাভাবিকভাবেই এখানে যে প্রশ্নটা না এসে পারে না, তা হচ্ছে, বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্য যেখানে একে অপরকে উচ্ছেদ করা সেখানে এই পুঁজিবাদী সমাজটা টিকে আছে কী করে? কেনই বা সকলে এই সমাজের আইন-কানুন-নিয়ম-শৃঙ্খলা কমবেশি মেনে চলছে? পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফা লোটার কাজে সমাজে যে উৎপাদন হচ্ছে, সেই উৎপাদনে শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করছে কী করে? বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী এই যে দুটো পরস্পরবিরোধী শক্তির একে অপরকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার কথা, তারা আবার কীভাবে পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে? আর, এ ধরনের ঘটনা দুনিয়াতে আজ ঘটছে তা নয়, ইতিপূর্বেও এ জিনিস ঘটতে দেখা গেছে। সেই পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার যুগে যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে গড়ে-ওঠা পুঁজিপতিশ্রেণী সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তখনও এই জিনিস ঘটেছে। ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র বা 'ফিউড্যালিজম্' যতদিন টিকে ছিল, পরস্পরবিরোধী স্বার্থ নিয়ে চলা সত্ত্বেও সেটা টিকে ছিল সামন্তপ্রভু ও বুর্জোয়াশ্রেণী এই দুই শ্রেণীর ঐক্য ও সমঝোতার ভিত্তিতে। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, আবার আপস করেছে। আপস করেছে কেন? যতক্ষণ পর্যন্ত সামন্ততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করতে না পেরেছে, উচ্ছেদ করার মত ক্ষমতা বা শক্তি অর্জন না করেছে ততক্ষণ সেই স্থায়ী ও শক্তিমান রাজশক্তি বা সামন্তী শক্তির সাথে গড়ে-ওঠা পুঁজিবাদী শক্তিকে আপস ও মীমাংসা করেই থাকতে হয়েছে এবং এই মীমাংসা যে শক্তিমান তার অনুকূলেই করতে হয়েছে। নিজেদের স্বার্থকে যতটা রক্ষা করা যায় বা যতটা শক্তিবৃদ্ধি করা যায় সেদিকে লক্ষ রেখেই বুর্জোয়াশ্রেণীকে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করে চলতে হয়েছে। অর্থাৎ, সামন্ততন্ত্রকে ভাঙবার মত চূড়ান্ত শক্তি যতক্ষণ না বুর্জোয়ারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে ততক্ষণ তাদের বারবার সামন্ততন্ত্রের সাথে 'কম্প্রোমাইজ' করতে হয়েছে। এই কারণেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বুর্জোয়াশ্রেণী ও সামন্তপ্রভু এই দুই বিরোধীশক্তির দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্র টিকে ছিল, যেমন আজ টিকে আছে পুঁজিবাদ।

এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় আপনারা কী দেখছেন? এখানে শোষণের চাপে কখনও কখনও মজুররা

বিক্ষুব্ধ হয়ে মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, এমনকী ধর্মঘটও করছে। কিন্তু, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কি মজুররা ধর্মঘট করতে পারে? না, পারে না। কারণ, প্রতিদিন মজুররা ধর্মঘট করলে খাবে কী? ফলে, কাজ না করে তারা থাকতে পারে না। আর, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে চাইলেই তো আর বিপ্লব হয় না। আপনারা সকলেই জানেন যে, ধর্মঘট মানেই বিপ্লব নয়। একটা কারখানার মজুররা মালিকের বিরুদ্ধে লড়ছে, শ্রমিকরা খুব বিক্ষুব্ধ হচ্ছে — একথার মানে এই নয় যে, তখনই বিপ্লবটা হয়ে গেল, মজুরশ্রেণী ক্ষমতা দখল করে ফেলল, আর পুঁজিপতিশ্রেণী লোটা-কম্বল নিয়ে পাততাড়ি গোটাল। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে পুঁজিপতিশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার মত প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শক্তি শ্রমিকশ্রেণী সঞ্চ য় করতে না পারা পর্যন্ত আপনারা যদি মনে করেন যে, পুঁজিপতিশ্রেণী যেহেতু আমাদের শত্রু তার সাথে আবার বৈঠক কী, বা তার সাথে আবার আপস কী, তাহলে ভুল করা হবে। এরকম কাজ আমরা করতে পারি না। আমাদের মজুরদের বোঝাতে হবে যে, এই পথে তারা নিজেদের অনেক শক্তি ক্ষয় করতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা পুঁজিবাদের কেশাগ্রও তারা স্পর্শ করতে পারবে না। বরং এই উগ্রতার ফলে কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হবে, যতটুকু বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার ওপর নেমে আসবে আচমকা আঘাত। এই আঘাত অবশ্য আরও নানা পথে আসতে পারে, সেটা ভিন্ন আলোচনা।

বিপ্লবের জটিলতা যাঁরা বোঝেন না তাঁদের খেয়াল রাখা উচিত যে, শুধু 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে চীৎকার করলেই বিপ্লব আসতে পারে না। এই বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে নানা জটিলতা আছে, তার উত্থান-পতন আছে, 'ট্যুইস্ট অ্যান্ড টার্ন' আছে, বহু আপসও আছে। 'বিরোধী শক্তির ঐক্য' এই নীতিটির মূল কথা হচ্ছে যে, শত্রুকে উচ্ছেদ করার মত শক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত এই ঐক্য বা আপস করতে হবে ঠিকই, কিন্তু এই আপসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শক্তি সঞ্চ য় করা, শত্রুকে উচ্ছেদ করার মতো উপযুক্ত ক্ষমতা অর্জন করা — কিছু সুবিধা আদায় বা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করা নয়। তাই সেই ধরনের শক্তি সঞ্চ য় করার আগে পর্যন্ত দেখা যায় বার বার মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের লড়াই হচ্ছে, আবার সেই শ্রমিকই মালিকের অধীনে কাজ করছে, উৎপাদনে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং, এই যে উৎপাদন হচ্ছে, উৎপাদন ব্যবস্থা চালু আছে — এই সবকিছু হচ্ছে 'বিরোধী শক্তির ঐক্য'-এর নীতি মেনে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে যাঁরা এই নীতিটি বুঝতে পারেননি তাঁরা উগ্র বামপন্থী রাজনীতির চর্চা করেছেন, 'সিন্ডিক্যালিজম্'-এর মত ধ্বংসাত্মক রাজনীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পথ দেখাতে পারেননি। 'বিরোধী শক্তির ঐক্য'-এর নীতিকে আপনাদের এভাবেই বুঝতে হবে।

বিকাশের পথে অবলুপ্তি, অবলুপ্তির পথে বিকাশ

Negation of the Negation

থ্রি প্রিন্সিপ্লস-এর তৃতীয় নীতিটি হচ্ছে, 'নিগেশন অভ দি নিগেশন'। এই নীতিটির অর্থ হচ্ছে, দুনিয়াতে নিছক সৃষ্টি বা নিছক ধ্বংস বলে কিছু নেই। সৃষ্টি মানেই হচ্ছে ধ্বংস, আবার ধ্বংসের মধ্য দিয়েই নতুনের সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ, বিকাশের পথেই অবলুপ্তি, আবার অবলুপ্তির পথে বিকাশ। যেমন ধরুন, মানব দেহ। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই মানবদেহের কতকগুলি অধ্যায় থাকে — শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং তারপর বার্ধক্য। এই হচ্ছে মানবদেহের পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তর এবং এই পরিবর্তনের প্রতিটি স্তরেই একটির ধ্বংসের মধ্য দিয়েই অপরটির সৃষ্টি হয়। যেমন, একটি শিশুর দেহের মধ্যে প্রতিদিন যে পরিবর্তন ঘটে, এই প্রতিদিনের পরিবর্তন আমরা ধরতে পারি না। কিন্তু, আমরা ধরতে পারি না একথার মানে এই নয় যে, শিশুটির দেহে প্রতিদিন কোন পরিবর্তনই ঘটছে না। কারণ, হঠাৎ একটা সময়ে এসে আমরা আবিষ্কার করি যে, শিশুটি আর শিশু নেই, সে কৈশোরে পদার্পণ করেছে। ঠিক একইভাবে নজরে পড়ে, কৈশোর অতিক্রম করে সে যুবক হয়েছে। তারপর প্রৌঢ়ত্ব এবং শেষপর্যন্ত সে বার্ধক্যে পা দিয়েছে। মানবদেহের পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে লক্ষ করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, প্রতিমুহূর্তে না ধ্বংস করতে পারলে শিশু কখনও কৈশোরে পদার্পণ করতে পারে না। একটি শিশু কৈশোরে পা দিয়েছে মানেই হ'ল শৈশবকে তিলে তিলে খতম করে সে কৈশোরে পদার্পণ করেছে। একই প্রক্রিয়াতে কৈশোরকে তিলে তিলে ধ্বংস করে সে পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছে এবং যৌবনকে খতম করেই সে প্রথমে প্রৌঢ়ত্বে, পরে বার্ধক্যে পৌঁছেছে। তাই নিছক ধ্বংস বলে কিছু নেই, নিছক সৃষ্টি বলেও কিছু নেই। 'সিম্পল নিগেশন' নয়, নিগেশন অভ দি নিগেশন।

নিগেশন অভ দি নিগেশন -কে সেই কারণেই আমি বলেছি, বিকাশের পথে অবলুপ্তি, অবলুপ্তির পথে বিকাশ। ক্রমাগত পুরাতনকে, অতীতকে ধ্বংস করতে না পারলে নিত্যনতুনের বিকাশ হয় না। সেই কারণেই সৃষ্টি এবং ধ্বংস ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

সমাজের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা সকলেই অবগত আছেন যে, মানুষের সমাজ আদিম অবস্থায় শ্রেণী বিভক্ত ছিল না। ঐতিহাসিক কারণেই উৎপাদনের একটা স্তরে এসে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হ'ল। আদিম অবস্থায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের দ্বন্দ্বই ছিল সমাজের মূল দ্বন্দ্ব। কিন্তু, যেদিন থেকে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হ'ল সেদিন থেকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগ্রাম চলছিল তার সাথে যুক্ত হ'ল শ্রেণীদ্বন্দ্ব। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সমাজে এই শ্রেণীসংগ্রামের রূপ যেমন পাল্টেছে, তেমনি তা ক্রমাগত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, যেটা আজ পুঁজিবাদী সমাজে এসে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিন্যাসের দিকে যদি লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর সমাজপরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় সমাজে ক্রমপর্যায়ে দাসপ্রভু-দাসে বিভক্ত সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্ম হয়েছে। সমাজকাঠামো ও তার শ্রেণীবিন্যাসকে লক্ষ করলেও একথা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে যে, দাসপ্রভু-দাসে বিভক্ত যে সমাজ সেটা নিজেকে ক্ষয় করার পথেই পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ার পথ বেয়েই পর পর সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ একটি সমাজের মৃত্যু ঘটলেও সামগ্রিকভাবে সমাজের মৃত্যু ঘটছে না, ঘটতে পারে না। পরিবর্তন যেটা হচ্ছে, সেটা হল, একটা বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থা থেকে অন্য একটা সামাজিক ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটছে। সুতরাং, সমাজের ক্রমবিকাশের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও এই নিগেশন অভ দি নিগেশন-এর মূল নীতিটি কাজ করছে।

নিগেশন অভ দি নিগেশন-কে আর এক দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। আপনারা সকলেই জানেন, বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামে সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার পর পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজের মাঝখানে অন্তবর্তীকালীন (transitional period) যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, সেই সময়েও সর্বহারার একনায়কত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করার কাজে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে এক কঠিন ও কঠোর সংগ্রাম চালাতে হয়। এই সময়ে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের অবলুপ্তি ঘটে না। শ্রেণীসংগ্রাম আরও জটিল ও সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে। আর, এই সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণীর হাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ও তার সঠিক নেতৃত্বকারী ভূমিকা। আবার, সমাজ-অগ্রগতির মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্তর অতিক্রম করে মানুষ যখন সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছাবে, অর্থাৎ যখন সমাজে উৎপাদন ও বণ্টনকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে এবং বেশিরভাগ মানুষের সংস্কৃতিগত, রুচিগত মান এমন স্তরে পৌঁছাবে যে, সামাজিক স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব মিলনাত্মক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হবে, সেদিন সমাজে শ্রেণী অবলুপ্তির সাথে সাথে রাষ্ট্র এবং পার্টিরও অবলুপ্তি ঘটবে। মনে রাখতে হবে যে, এই শর্তগুলো পূরিত না হওয়া পর্যন্ত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এখানে রাষ্ট্র বা পার্টির এই যে অবলুপ্তি ঘটবে, আপনারা মনে রাখবেন, সেটাও ঘটবে নিগেশন অভ দি নিগেশন-এর নীতিকে অনুসরণ করেই।

এখন আপনাদের নিজেদের যেটা ভালো করে বুঝতে হবে এবং দেশের মানুষকে বোঝাতে হবে, সেটা হ'ল, এই পুঁজিবাদী শোষণ ও দুর্দশা শাশ্বত নয়। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থারও একদিন মৃত্যু ঘটবে — আমাদের দেশে এবং দুনিয়ার সর্বত্র। কিন্তু, এই পরিবর্তনের জন্য যেটা প্রয়োজন, সেটা হ'ল, জনসাধারণের মনে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা ছেয়ে আছে — জন্ম, মৃত্যু, অর্থনৈতিক দুর্দশা ইত্যাদি নানা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে — তাদের মন থেকে সেই মিথ্যা ও ভ্রান্ত ধারণাগুলো আপনাদের কাটাতে হবে, অর্থাৎ, সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে এবং তারই সাথে সাথে সমাজে প্রতিমুহূর্তে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার প্রক্রিয়াকে আপনাদের ত্বরান্বিত করতে হবে। এককথায়, শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করা এবং সেই সংগ্রামকে সফল বিপ্লবের পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার মত উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে আপনাদের শক্তিশালী করতে হবে, গণসংগ্রাম ও গণআন্দোলনগুলোকে দুর্বার করে গড়ে তুলতে হবে। একাজ নির্ভর করছে

আপনাদের সকলের সচেতন ভূমিকা পালন করার ওপর এবং মার্কসবাদী দর্শনকে শুধু বই পড়ে বা মুখস্থ করে নয় — জীবনে এবং কর্মে প্রয়োগ করে সকলের উপলব্ধিকে স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল করা এবং যথার্থ কমিউনিস্ট বিপ্লবী চরিত্রের উন্নত রুচিগত মান অর্জন করার ওপর। আপনারা মনে রাখবেন, এই কাজে আপনারা যত দ্রুত সফলতা অর্জন করতে পারবেন, ভারতবর্ষের বিপ্লব তত বেশি ত্বরান্বিত হবে। এই কথা বলেই এই শিক্ষাশিবিরে মার্কসবাদী দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা আমি এখানে শেষ করলাম।

১ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে জানা গেছে যে, এখানে গ্যাস এবং ডাস্ট পার্টিক্‌ল্‌ও আছে।

২ বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল (Maxwell) এটা স্পষ্ট করে বলেন (1873) ঃ ''There can be no doubt that the interplanetary and interstellar spaces are not empty but occupied by a material substance or body, which is certainly the largest, and probably the most uniform body of which we have any knowledge.''

৩ ম্যাক্রোবডির গতির প্রকৃতি থেকে এই সিদ্ধান্তই হয় যে, গতিপথে বস্তুর অবস্থান ও ভরবেগ দু'টি পরস্পর-নিরপেক্ষ determinate factor বা property — যে কারণে একই সঙ্গে এদের সুনিশ্চিত করে বা সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা সম্ভবপর। পরিমাপনের সীমাবদ্ধতার কারণে পরিমাপের যতটুকু ভুল (error) বা পার্থক্য ঘটে, যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে সেটা ইচ্ছামত কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু মাইক্রোপার্টিক্‌ল্‌-এর (যেমন ইলেকট্রনের) গতিপ্রকৃতির বিচারে দাঁড়ায়, এক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থান ও ভরবেগ পরস্পর পরিপূরক বা complementary property — যে কারণে একই সঙ্গে এদের অবস্থান ও গতিবেগের পরিমাপ সুনিশ্চিত করে করা সম্ভবপর নয়। একই পরীক্ষায় একইসঙ্গে মাপতে গেলে পরিমাপের ভুলের মাত্রার হেরফের এমন হবে যে কোন উপায়েই তাকে একটা ন্যূনতম মান থেকে কমানো সম্ভবপর নয় — এটাই হাইসেনবার্গের আন্‌সারটেনটি প্রিন্সিপ্‌লে প্রকাশিত। যন্ত্রপাতির উন্নতির ওপর এ বিষয়টা নির্ভর করে না। মাইক্রোপার্টিক্‌ল্‌-এর নিজস্ব বিশিষ্ট গতিপ্রকৃতিকে অবস্থান ও ভরবেগের ম্যাক্রোবডিভিত্তিক পরস্পর-নিরপেক্ষ property হিসাবে যে concept, তা দিয়ে ধরতে গেলেই পরিমাপনের এই অনিশ্চয়তা আসছে — এখানে দার্শনিক বিভ্রান্তির কিছু নেই, কোন মিস্টিসিজম্‌ এখানে কাজ করছে না। বিষয়টা এমন নয় যে এখানে কার্যকারণ সম্পর্ক কাজ করছে না। কোন্‌ বিশেষ চরিত্রের কারণ এখানে ক্রিয়াশীল সেটা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথেই জানা যাবে, ফলে কার্য-কারণ সম্পর্কিত ধারণার বিকাশ ঘটবে।

৪ অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ বস্তুর পরিমাপনের (যেমন, ওজনের) জন্য ব্যবহৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির গঠননীতির (principle of construction) কারণেই প্রতিবারের পরিমাপন যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ measuring condition-এর সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে কোন দু'টি পরিমাপই সূক্ষ্ম বিচারে এক হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে বস্তুর নিজস্ব পরিবর্তনও ঘটে, সেক্ষেত্রেও পরিমাপের সূক্ষ্ম তফাৎ ধরা পড়ে।

১৯৬৪ সালের ২৬-২৮ জুন
দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির
আহ্বানে কলকাতায় অনুষ্ঠিত
রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের আলোচনা।
বাংলায় পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়
১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে।